দাম : দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পরিচয়

কার্তিক ১৩৬৮

অশোক কুমার দত্ত
তুষার চট্টোপাধ্যায়
বিষ্ণু দে
রণধীর মিত্র
শ্যামসুন্দর দে
রণজিৎ সিংহ
বীরেন্দ্র নিয়োগী
সুশোভন সরকার
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবীপদ ভট্টাচার্য
কার্তিক লাহিড়ী
শিবশম্ভু পাল
মাণিক রায়
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়



'এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত নেই ···! বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিটফাট রাখতে চান, তা'হলে কাপড় কাচাটাতো লেগেই আছে।'

'সানলাইটে কাচি, তাই রক্ষে! শুধু পেরে উঠছি সানলাইটের দেদার ফেনায় কাচাটা খুবই সহজ বলে। কেবল এমন খাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন কষ্ট না করে।'

৫৪ নং ফ্ল্যাট, ভগতসিং মার্কেট, নয়া দিল্লীর শ্রীমতী ওয়াদওয়ানি বলেন, 'কাপড়কাচায় সানলাইটের মতো এত ভাল সাবান আর হয় না।'

সানলাইট

SUNLIGHT SOAP

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S. 31-X29 BG



দিনে দিনে নতুন রেক্সোনার পরশে ত্বকে নবীন লাবণ্য আসে



যতবারই মাখুন রেক্সোনার অবাক পরশ যেন প্রতিবারই আপনার ত্বকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল রেক্সোনার ক্যাডল আছে–বিশেষ ধরনের এই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক তেলটি ত্বকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায় আর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায় আপনার লাবণ্য আনে।

মিষ্টি গন্ধ ভরা রেক্সোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাখলে আপনি এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে পাবেন।





নতুন রেক্সোনার নতুন মোড়ক, নতুন আকার আর নবীন সবুজ রঙ আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন রেক্সোনা-ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক

ভারতে রেক্সোনা প্রোপাইটরী অষ্ট্রেলিয়া লিমিটেডের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী



পরম আনন্দের দিন ...

আপনার মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে এখনও অনেক দেরি? না। বিচক্ষণ পিতার পক্ষে তা কখনই নয়। শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতী তিনি নন্। আপনি বিয়ের সময় মেয়েকে মনের মতো সব সেরা জিনিসই দিতে চান। কিন্তু তার মানেই হ'ল অনেক টাকার ব্যাপার। এখনই ব্যবস্থা করে রাখুন যাতে সে সময় এই অতিরিক্ত খরচ মেটাতে আপনার কোন রকম অসুবিধা না হয়। আপনার মেয়ে ছোট্ট খুকিটি থাকতেই একটি 'ম্যারেজ এন্ডাউমেন্ট' পলিসি নিয়ে রাখলে ঠিক দরকারের সময়টিতে এক থোক মোটা টাকা হাতে পাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে থাকবে। আপনার জীবন বীমার এজেন্টের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিন। তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্যই রয়েছেন। আপনার আয় যাই-ই হোক আপনার উপযোগী পলিসি পাবেন।



জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

LICB-28A BEN



সম্পাদক
গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



পরিচয়

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ৪

কার্তিক, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

অশোককুমার দত্ত

শ্রদ্ধাভাজন রাজশেখর বসু যাকে "পরিপূর্ণ সাহিত্য" বলেছেন আমাদের এতো গৌরবের ভাষা বাংলা আজো তা দাবি করতে পারে নি। কবিতা উপন্যাস বা গল্প সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মোটেই অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু শুধুমাত্র রস সৃষ্টির প্রতিভা তাকে পূর্ণরূপ দেয় না। সাহিত্য কথাটার মধ্যে যে একটা সহিতত্ব বোধ আছে, আমাদের দেশের বিজ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যার কর্মীদের সাথে সে যোগ বড় ক্ষীণ। যে কোনো বছরের বাংলা বইয়ের তালিকা বিশ্লেষণ করলেই হিসাবটা আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত মোট ২২৫০টি বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ বিদ্যার আলোচনা ছিল মাত্র ১৬৫টিতে, শতকরা হিসাবে এ হল মাত্র ৭·৩ ভাগ (তুলনীয়: জর্মান বা ফরাসী ভাষায় প্রায় ২০ ভাগ)। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পরিচিত সমস্যাটি হল পরিভাষা, অর্থাৎ যে শব্দ বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রে এসে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে এবং সে অর্থ সহসা বিস্তৃত বা পরিবর্তিত হবে না। যে বিজ্ঞান আমাদের ভাষার কাছে এতদিন প্রায় অপরিচিত ছিল তার আলোচনায় আমরা যে উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করব এতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু শুধু সমস্যার কথা ভেবে যদি নিষ্ক্রিয় থাকি, ভাষা তার সৃষ্টির কাজ সংগ্রহের কাজ চালাতে পারে না। আজকের এই বাংলা ভাষাও তার প্রাথমিক অবস্থায় বিপুল শব্দ সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয় নি, কিন্তু নদী যেমন আপন প্রয়োজনে বেগকে সঞ্চিত করে ক্রমশ বিস্তৃত হয়, ভাষাও তেমনি বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনে নানা শব্দকে

আহরণ করেছে, আবার বাতিলও করেছে—এভাবে নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব এক ভঙ্গি গড়ে ওঠে। আজকের যুগের বিশেষ প্রয়োজনের চাপে পড়ে বিজ্ঞানাশ্রয়ী বাংলা ভাষাকে আবার তেমনি নতুন করে তৈরি হতে হবে। এজন্য সবচেয়ে আগে দরকার বিজ্ঞান-অভিজ্ঞ লেখকদের দ্বারা ভাষা অনুশীলন। যারা তাঁদের বিষয়কে জানেন এবং সাধারণ লোকের জন্য তা প্রকাশ করতেও পারেন, এমন লোকের সংখ্যা মণিকাঞ্চনযোগের মতোই দুর্লভ। অতীতে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে আমরা এ যোগাযোগ লক্ষ্য করেছিলাম। দুঃখের বিষয় সে ধারা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নি। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রমই। প্রারম্ভের ক্ষীণ ধারা যে ভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সেভাবে প্রসারিত হয় নি। ক্রমাগত বিদেশী ভাষার অনুশীলনে বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের 'ছোট' মনোভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক, তাছাড়া মাতৃভাষায় লেখা বইয়ের শেষ পর্যন্ত যে কি গতি হবে তা ভেবেও অনেকে দ্বিধাগ্রস্থ থাকেন। সরকারী পোষকতার ফলে হিন্দীভাষা এই মনোভাব জয় করেছে। আমরা যে ভাষাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলি সেই হিন্দীতেই ১৯৫৮ সালে মোট ৪০৮টি বিজ্ঞানের বই (শতকরা হিসাবে ১০·৮ ভাগ) প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য কৃতিত্ব শুধু পরিসংখ্যান বিচার করে না। কিন্তু অধিক সংখ্যায় এই পুস্তক প্রকাশের নিশ্চয় একটা ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশের দিকে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

হিন্দীভাষী ডঃ রঘুবীরের মতো এখানেও অনেকে আছেন যাঁরা প্রতিটি বিদেশী কথার বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজেন। ডঃ রঘুবীর প্রবল 'বিক্রমে' রামায়ণ তুল্য পরিভাষা কোষ রচনা করেছেন, কিন্তু অসংখ্য "রাবণ সৈন্য"-র কয়টিকে তিনি হিন্দীভাষার "শরে" আবদ্ধ করতে পারেন। বিজ্ঞানের যেমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংখ্যাও তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পদার্থবিদ্যা (health physics) কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানের এক অকল্পনীয় বিষয় ছিল, আজ কিন্তু তা পরমাণু বিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে ভূ-পদার্থবিদ্যা (geo-physics) বা ইলেকট্রনিক্স্-এর তত্ত্বগুলি আরম্ভের পর্যায়ে ছিল মাত্র, কয়েক বছরের ব্যবধানে আজ তা এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যে কোনো শব্দকোষে এদের নিয়ে বেশ কয়েক হাজার নূতন পরিভাষার খোঁজ পাওয়া

যায়। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই এভাবে প্রসারিত হচ্ছে। বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যে দ্রুত পরিবর্তন তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া তথাকথিত আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির পক্ষেও সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বাধুনিক গবেষণার কথা জানার জন্য উন্নত ভাষাগুলি আজ তাই দ্রুত অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছে। উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা অনুশীলন অনেকদিন থেকেই চালু হয়েছিল, আজ এই প্রয়োজন অত্যাবশ্যকরূপে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী বৈজ্ঞানিক ভাষা অনুশীলনের রূপ যখন এই তখন এ সমস্ত আলোচনায় অনভ্যস্ত ভারতীয় ভাষাগুলির অপ্রস্তুত দিকটা আমাদের বিবেচনা করতে হয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি তার অনুপূরকরূপে ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার চর্চাও আমরা পুরোপুরি বাদ দিতে পারি না। এমন অবস্থায় অনেকে বিদেশী পরিভাষাকে বাংলা হরফে প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছেন। যোগ্য লেখক যদি ভাষার গ্রহণ ক্ষমতাকে বাড়াতে পারেন তাহলে আজকের প্রচলিত অনেক বিদেশী শব্দের মত এই পরিভাষাগুলিও আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ক্রমাগত চর্চার ফলে কারখানার ইংরেজী না-জানা শ্রমিকেরাও আজ বলেন—ক্রেন, লেদ, সিমেন্ট, বীম, রড, গিয়ার (gear), মোটর, পাইপ, হ্যাণ্ডেল, ইঞ্জিন, টাইম, আন্‌-লোড (un-load), প্রডাকশন ইত্যাদি। আমাদের অনেকে আজো রসায়ন শাস্ত্রের মানে ধরতে পারি না কিন্তু 'ক্যামিষ্ট্রি' বললে অনায়াসে বুঝে নি। 'ক্যালকুলাস'-এর বাংলা যে ব্যসকলন কথাটা অনেকে বোধহয় এই প্রথম শুনলেন। ভাষা-পণ্ডিতদের বিতর্কের অপেক্ষা না রেখে অনেক বিদেশী পরিভাষা আমাদের ঘরোয়া গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে, এতদিন পরে তাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা তীরের বালুকণা থেকে নদীর জলকে বিশুদ্ধ করার মতোই হাস্যকর হবে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির ব্যাপকতার দিক দেখে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম, উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বদাই আমাদের বিদেশী ভাষার সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য হোক, কিন্তু তার আগে বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলিকে সহজ করে সাধারণ করে দেশের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। এ কাজ ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে, কিন্তু পরিভাষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো

নির্দিষ্ট মতধারা অনুসরণ সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে আগে থেকেই ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না, কাজের মধ্য দিয়েই সমস্ত ধারণা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটুকু বুঝতে কারো কষ্ট হয় না, ছোট ছোট বিদেশী কথা সহজেই ভাষার মধ্যে চলে আসে। আবার উদাহরণ দিই—এটম, আয়ন, নিয়ন, প্রোটন, ভোল্ট, গ্রিড ইত্যাদি। রাসায়নিক জিনিষের নাম (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সুপারফসফেট ইত্যাদি), ওষুধের নাম (এনাসিন, প্যারামাইসিটিন, থালাজল, এনট্রোকুইনল ইত্যাদি), বাণিজ্যিক নাম (trade name—পেট্রল, ডেটল, সুলেখা কালির 'এস-সল্' ইত্যাদি) মানুষের নামের মতোই সরাসরি ভাষায় ব্যবহার হবে। কারো নাম যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয় স্বজাতীয় করার চেষ্টায় তাঁকে 'চু-চেন-তাং' বলতে যাওয়া জটিলতাই বাড়িয়ে তোলে মাত্র। গাছপালা ও জীবজন্তুর নাম বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা মেনে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আছে (যে কারণে জলকে রসায়ন বিদ্যায় হাইড্রোজেন মনোক্সাইড এবং সাধারণ লবণকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয়)। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এ সমস্ত দুরূহ নাম প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দুস্তর বাধা, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান চর্চার উন্নততর ও প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যেতে পারে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তরলতাকে Ipomoea quanmoelit বা পটলকে Trichosanthes Dioica বলার প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু ছাত্র যদি জীব ও উদ্ভিদ বিদ্যায় অগ্রসর হতে চান বিজ্ঞান অনুমোদিত নামগুলিই ক্রমে জেনে নিতে হবে। আমাদের ভাষার কাছে পরিচিত বলেই এ সমস্ত দেশী নাম ব্যবহারে আমাদের আপত্তি থাকে নি, কিন্তু শব্দ পণ্ডিতদের তৈরি রাসায়নিক জিনিষের কৃত্রিম পরিভাষা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করবে মাত্র। এ কথা ভুললে চলবে না যে এই সমস্ত পরিভাষা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর দ্বারা নানা বিচারের পর রচিত হয়েছিল। 'স্বজাতীয়করণ'-এর মোহে তা যদি আমরা না মেনে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে যাই ভাষা তা গ্রহণ করতে চাইবে না। নেপথলিনকে যাঁরা 'উৎতৈলনীল' বা নাইট্রিক এসিডকে 'ভূয়িক অম্ল' বলতে চান জাপান তাঁদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হোক। অ্যামোনিয়াম সালফেটের পরিভাষা না খুঁজে দেশের মাটিতে তা তৈরি করতে যাওয়া আজকের এবং আগামীকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

পরিভাষা সৃষ্টিই বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান সমস্যা নয়, ভাষার মাধ্যমে তা লোকের বোধগম্য করে তোলাই হচ্ছে আসল কাজ। পেট্রোলিয়ামকে 'দূতৈল' বা Induction Coil-এর বাংলা 'আবেশ কুণ্ডলী' লিখে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি কিন্তু তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয় না। পরিভাষা যাদের পক্ষে সমস্যা নয় সে সব ভাষাতেও এই বোঝানোর অসুবিধা রয়েছে। ইংরেজী Resistance-এর আক্ষরিক প্রতিশব্দ রোধ বা বাধা, বিদ্যুৎ বিজ্ঞানে তা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেছে—'বিদ্যুৎ প্রবাহের যে বাধা উত্তাপ সৃষ্টি করে।' Energy-এর মানে আমরা 'শক্তি' বলতে পারি, Power-এর বাংলা হয়েছে 'ক্ষমতা'। কিন্তু এর দ্বারা Energy এবং Power-এর মূল প্রভেদটা প্রতীয়মান হয় না। একটি পরিমাণগত এবং অপরটি সময়নির্ভর পরিমাপ। Basic English-এর অনুকরণে ডবলু. ই. ফ্লুড নামে এক ব্যক্তি অগণিত ইংরেজী পরিভাষা থেকে মাত্র ২০১২টি শব্দ নিয়ে লোকবিজ্ঞানের একটি পরিমিত শব্দকোষ (Consolidated Popular Science Vocabular) রচনা করেছিলেন, কিন্তু এই বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞজন তা অনুমোদন করেন নি। কন্‌সেপশন জিনিষটা এককভাবে পরিভাষার উপর নির্ভর করছে না, শব্দের সঙ্গে শব্দ যোগ করে লেখক যে মোট প্রতিফলটি রচনা করেন মূলত তাকেই তা আশ্রয় করে থাকে। আলো কথাটার মানে তো আমাদের জানা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে তা আরো ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছে। আমাদের পরিচিত অনেক কথার মধ্যেই বিজ্ঞান এভাবে নূতন তাৎপর্য যোগ করেছে—পরিভাষার লক্ষণই হল তাই, কিন্তু আমরা অনেক সময় এ বিষয়ে সচেতন থাকি না। বিদেশী অপরিচিত পরিভাষা এদিকে আমাদের চিন্তা করার এক বাড়তি সুযোগ এনে দেয়। আলো-কে 'লাইট' বলতে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে আরো উদার উন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিতে হবে। 'সল্ট'-এর পরিভাষা আমরা অনায়াসেই লবণ বলতে পারি, 'লাইম'-এর মানে এতদিন চুণ জেনে এসেছি—বিজ্ঞানের বইতেও তাই বলব, 'স্লেইক লাইম'-এর পরিভাষা পাথুরে চুণ বা কড়া চুণ পল্লীবাসীর মুখেও শোনা যায়, সুতরাং প্রাথমিক জ্ঞানের খাতিরে তাও মেনে নিলাম। এভাবে অনেক পরিভাষা আমাদের মধ্যে সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথা আমাদের ভাষার কাছে এতদিন অপরিচিত ছিল শব্দ-পণ্ডিতদের কারখানায় সৃষ্ট তাদের

"ভারতীয়" পরিভাষা দেশী প্রত্যয় নিষ্পন্ন বলেই শুধু মেনে নেওয়া দেশের লোকের পক্ষে সহজ হবে না। এক সময় সোনা রূপা তামা ইত্যাদি নানা ধাতু বিভিন্ন চিত্র এঁকে চিহ্নিত করা হত, ১৮১১ সালে বারজেলিয়াস রোমান হরফের দ্বারা তা নির্দিষ্ট করার কৌশল আবিষ্কার করেন। সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো রসায়নবিত্যার এই সাংকেতিক লিপি সমস্ত বিষয়টিকে যে কত নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করেছে বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রও তা অনুভব করেন। অভারতীয় লিপির দোহাই দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনার ফল থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। সাংকেত লিপির মধ্যে থাকে যে চিত্রধর্মিতা তা ভাষা নিরপেক্ষ। ইংরেজীতে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনায় আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা ইত্যাদি গ্রীকলিপিগুলি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের ভাষাতেও নিশ্চয়ই তার আপত্তি থাকবে না। জ্যামিতিক শাস্ত্রে কোণ ত্রিভুজ বৃত্ত ইত্যাদি নানা চিত্রলিপির সঙ্গে আমরা পরিচিত থাকি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও তেমনি বিচিত্র প্রয়োগচিহ্ন রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত এ সমস্ত সংকেত বাংলা ভাষাও স্বীকার করে নেবে। গণিতের দশটি অঙ্কের আবিষ্কার এই ভারতভূমিতে হলেও স্কুলপাঠ্য বইতে এখন 1, 2, 3 ইত্যাদি আন্তর্জাতিক লিপিই মেনে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শুধু এ কারণেই যদি কোনো ছাত্র অঙ্ক ভুল যাওয়ার অনুযোগ দিয়ে থাকে বুঝতে হবে তার শিক্ষার মূলেই গলদ রয়ে গেছে।

রকেটের যুগে এসে পৃথিবীর সীমানাটাই আজ বেড়ে গেছে। বিজ্ঞান ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানের এই অতি উন্নতির যুগে আমরা একদিকে যেমন নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি, সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় তার আলোচনার ক্ষেত্র রচনার জন্য নূতন নূতন শব্দ অনেক গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান আমাদের ডাক দিয়েছে—পরিভাষাকে ভাষার পরিপন্থী হিসাবে নয়, যুগের প্রয়োজনে পড়ে ভাষার পরিধিকেই আবার বাড়িয়ে তুলতে হবে।

কবিতাগুচ্ছ

কে যেন হাওয়ায়

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কে যেন হাওয়ায় বাজিয়ে দিল সমুদ্র।
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম
আমি থান্-থান্ হয়ে ছড়িয়ে গেছি।
শুধু ভাঙ্গা-গড়ার শব্দ
আমার অস্তিত্বের চারদিকে।

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে যে আলোটা
এতক্ষণে অন্ধকার
গালে হাত দিয়ে যে ভাবনাগুলো অন্যমনস্ক
তারা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

তোমরা ছাখো—আমি এসেছি
শোনো আমি শব্দ করে কিছু ভাঙছি এবং গড়ছি
তারপর মনে করো আমিই দু'হাতে
হাওয়ায় বাজিয়ে দিচ্ছি সমুদ্র।

ফেরাবে কি মুখ

জিষ্ণু দে

আহা, হালকা দীপ্ত চোখের দৃপ্ত মায়া
আসবে কি তাতে দীঘির সে গভীরতা,
দীর্ঘ দুঃখস্নিগ্ধ চোখের ছায়া ?
হালকা ঝড়েই উড়বে কি ঝরাপাতা !

ভাসন্ত মেঘ থামবে কি তার পথে
ফেরাবে কি মুখ তপ্ত মরুর দিকে—
দীপ্র আকাশ দুঃখের কালি মেখে
পৃথিবীর হয়ে চাইবে কি বৃষ্টিকে ?

সমর্পণে

রণধীর মিত্র

তুমি বলেছিলে
পাহাড়ের ওপারে তোমার স্বপ্ন
যেখানে এক একটা ক্লান্ত দিন
বুদ্বুদ হয়ে মিলিয়ে যায়

পথের ধারে সারাবেলা
জ্বলছিল কত উৎসবের চিতা
তবু কোনো স্ফুলিঙ্গ
আমাকে স্পর্শ করেনি

(আমার যে রক্তাক্ত বন্ধুরা
আজকের সূর্যাস্ত দেখল না
তাদের হৃদয় আমি
তোমাকেই উৎসর্গ করলাম)

পাহাড়ের চূড়ায় এখন
শূন্যে শূন্যে অন্ধকার
তুমি বলেছিলে
তার পরেই তোমার রূপকথা

সেখানে পৌঁছব বলে
আমি নক্ষত্রের আলো এনেছিলাম
কিন্তু তা কুয়াশা হয়ে
ছড়িয়ে গেল।

একটি শব্দের জন্ম

শ্যামসুন্দর দে

অন্ধকারের আড়ালে রাত্রি
বিবর্ণ আকাশে তারকার নৈঃশব্দ্য
আর মাটির গভীরে কত মুখরতা
সূর্যের সকাল গোণে
যন্ত্রণায়।

বালিয়াড়ির শীর্ষে দাঁড়িয়ে…
প্রবাহিত সামুদ্রিক বাতাস
দুরান্তের কোন্ কথার কানাকানি
নিসর্গের নীরবতায় তাই শুনি।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে—
রাত্রির প্রহর ভেঙে ভেঙে
একটা জন্মের সকালের আকুলতা।

সময়ের স্রোত বয়ে গেল
বন্ধ্যা মুহূর্ত শুধু যন্ত্রণা
পরিক্রমা
তবুও তারার ঘোষণা।

পৃথিবীর গর্ভে কত অবগুণ্ঠিত প্রত্যয়
মাটির গন্ধে বেঁচে আছে
আর সেই ভ্রূণ বাসনা
জন্মের সকালের দিকে চেয়ে আছে।

আচ্ছন্ন অন্ধকারের প্রহরে দাঁড়িয়ে
সমস্ত ভয়ের মুহূর্ত পার করে বলি
জয় হোক !
জয় হোক জীবনের আকুলতার

সেই তরঙ্গিত শব্দ
ব্যাপ্ত হল একটি গ্রহের পরিমণ্ডলে।

সেইসব দুঃখ

রণজিৎ সিংহ

সন্ধেবেলার ঠাণ্ডা আকাশের নিচে শুয়ে আমরা তারা দেখতাম। মা গল্প বলত।

ছেলেবেলায় পশুশালার ঘোড়ার হ্রেষায় হাতির বৃংহনে ঘুম ভাঙত। চোখ মেলে দেখত রাঙা রোদ খেলছে সাতমহলার চূড়োয়। সেই ঠাট বজায় রাখার লড়াইয়ে বেদোরস্ত কয়েক পরগণায় আগুন ধরিয়ে দাদামশায় ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন। তারপর টাটি-মরাইয়ের ঘরে পালটা দিন কাটে।

গল্পের ঘোরে আকাশের তারা কখনো অবিশ্বাসে ঠিকরে উঠত কখনো ঝাপসা হ'ত।

আমাদের কৌতূহলে তাল রেখে মা আবার কোনোদিন গল্প বলত। তার রঙ আলাদা। পাড়া-পড়শির রঙ্গ-আমোদের গল্প, পরবের খুশির গল্প। আমাদের তাজা টগবগে রক্তে সাহসী আর লড়ুয়ে জোয়ানদের কথা জোয়ার ডাকত। হৃৎপিণ্ড থেমে যেত যখন শুনতাম, এক মা জমির দাঙ্গায়, সর্বনাশের তাণ্ডবে, সাত ছেলেকে টাঙ্গি বল্লম তুলে দিয়ে পিঠ ঠুকে দিয়েছিল।

এদিকে আনুকপার তোড়ে অনেক দূর ভেসে গেলে আমাদের হুঁশ হ'ত। জিগ্যেস করতাম, মা তোমার সেই আপন দুঃখ-দিনের গল্প?

রাতপহর থমথম করত আগ্রহে। মা অনেক ক'রে আমাদের মন ফেরাত; আমরা আকাশে চোখ রেখে তারার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আজ যা সবচেয়ে মনে পড়তে চায় সে গল্প মা কোনোদিন বলে নি।

অন্ত্য প্রহর

বীরেন্দ্র নিয়োগী

ঘুম ভাঙতেই টেবল-ক্যালেণ্ডারের ওপর চোখ গিয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ঘোলানো ভাবে শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আজ সাতাশে!

আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠতে গিয়েও আবার পাশ ফিরে শুলেন মিঃ চ্যাটার্জী। কি হবে এত সকাল সকাল উঠে! কেবল ভোর হয়েছে। শার্সি দিয়ে সকালের ম্লানাভ আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে ঘরের অন্ধকারটাকে ফিকে করে দিয়েছে। একটু নীলচে নীলচে দেখাচ্ছে দেয়ালগুলো।

কালও এই সময়ে ঘুম ভেঙ্গেছে মিঃ চ্যাটার্জীর। আর ঘুম ভাঙতেই একটুও দেরি না করে, আড়মোড়া ভেঙ্গে খাটের ওপর উঠে বসে পূব দেয়ালে ছোট্ট সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো মা কালীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে প্রণাম করেছেন ভক্তিভরে। তারপর খাট থেকে নেমে স্লিপার জোড়ায় পা গলিয়ে আস্তে আস্তে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছেন। জীবনের তিরিশটা বছর ঠিক এমনি নির্ভুলভাবে একটানা ছন্দের মতো কেটে গিয়েছে।

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আজ কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কি হবে এত সকাল সকাল উঠে! আজকেই অফিসের সঙ্গে শেষ পাট চুকিয়ে দিয়ে আসছেন। জাঁদরেল অফিসার মিঃ কে. পি. চ্যাটার্জি রিটায়ার করছেন আজ থেকে।

রিটায়ার। গা-টা যেন আবার ঘুলিয়ে উঠতে চাইছিল। মনে হল সুরমা আসছেন এ ঘরে। চট করে উঠে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি। সুরমা কি কিছু ভেবেছে নাকি? আজ আমার রিটায়ার করবার দিন, তাই মন খারাপ করে শুয়ে আছি! বিছানার ওপর উঠে বসে মা কালীর ছবির দিকে মুখ করে হাত জোড় করলেন। দেখুক সুরমা, যে বাঘা অফিসার জীবনের ত্রিশটা বছর নির্ভুল ঘড়ির কাঁটার মতো সব কাজ করে এসেছেন, আজও চাকরী জীবনের শেষ দিনটায় একটুও এলোমেলো হননি তিনি।

গলা খাঁকারি দিলেন দুবার। তারপর আস্তে খাট থেকে নেমে চটিতে পা গলালেন। সুরমা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। চট করে একবার স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হুঁ, যা ভয় করছিলেন তিনি, সুরমার চোখে সমবেদনা। আর ঠিক এই জিনিষটার মুখোমুখি হতে হবে ভেবেই কি জেগে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা তাঁর বিচ্ছিরি ভাবে ঘুলিয়ে উঠেছিল? দোরের দিকে এগুতে এগুতে দুবার গলা খাঁকারি দিলেন আবার।

—ঠাণ্ডা লাগল নাকি আবার? সুরমার উদ্বিগ্ন স্বর।

ভ্রু কুঁচকোলেন মিঃ চ্যাটার্জি—না, ভোরে একটু কনজেশন হয়েছিল গলার। কালও তো হয়েছিল। মৃদু স্বরে বললেন।

—রোজ এমন হওয়া তো ভালো নয়। ডাঃ মিত্রকে একটা ফোন করে দি? সুরমা দুপা এগিয়ে এলেন।

অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না। আর ফিরে তাকালেন না মিঃ চ্যাটার্জি। দরজার ভারী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

বাথরুমে ঢুকে যেন স্বস্তি পেলেন একটু। সাবান, ব্রাশ, পেষ্ট, তোয়ালে, তেল, জিভছোলা—সব পরিপাটি করে সাজানো। সুরমার হাতের ছোঁয়া না থাকলেও প্রখর দৃষ্টি রয়েছে সব কিছুর ওপর। স্বামী যে সকালের অনেকখানি সময় এ ঘরটায় কাটান, এ সত্য কোনোদিনই ভোলেননি সুরমা।

দেয়ালে টাঙানো পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় আয়নার মধ্যে এক প্রৌঢ়ের ছবি ফুটে উঠল। ফরসা শরীর, গোল ভারী মুখ, থুতনিতে খানিকটা চর্বি জমেছে। এই ভারী মুখখানাকে ভয় না করেছে এমন সাব-অডিনেট কোনো অফিসার চোখে পড়েনি তাঁর। বেয়ারাকে দিয়ে ডাক পাঠালেই সবাই তটস্থ হয়ে ছুটে এসেছে। ঘরের স্থইং ডোরে কাঁপা কাঁপা হাত রেখেছে। আর সেটা দেখে আরো সোজা আরো গম্ভীর হয়ে বসেছেন তিনি। ঘরে ঢুকে কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে ভীরু পা ফেলে এগিয়ে এসেছে এক সন্ত্রস্ত অফিসার বিরাট ঘরের শেষ কোণে বাঁকা করে বসানো তাঁর টেবিলটার সামনে। একটা অস্ফুট নমস্কারের প্রত্যুত্তরে শুধু হাতের কলমটা ঈষৎ মুখের দিকে তুলেছেন মাথা

না তুলেই। একটা স্তব্ধতা। মাথার ওপরে ফ্যানের সঞ্চালনের মসৃণ শব্দ, টেবিলের ওপর শেড দেওয়া টেবিল আলোর একটা বৃত্ত। এই মুহূর্ত কয়টি বড় মূল্যবান আর বড় উপাদেয় লেগেছে তাঁর। মনে হয়েছে, যেন তিনি ভগবান। ইচ্ছে করলে এক লহমায় সামনের ওই দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারেন, আবার হয়তো নতুন করে গড়েও তুলতে পারেন পরমূহূর্তে।

মাথার টাকে ডান হাতখানা রাখলেন মিঃ চ্যাটার্জি। এই সব মুহূর্তগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা। অফিসের একপ্রান্তে একখানা সাজানো ঘরের মধ্যে শুধু বসে থেকেই প্রতিটি কর্মচারীর কাছে নিজের অশরীরী অস্তিত্বকে অনুভব করিয়ে ওদের দিয়ে সদাসন্ত্রস্ত ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না।

হঠাৎই যেন চমকে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি। আয়নায় এ কার মুখ দেখছেন তিনি? স্তিমিত দৃষ্টি, বিবর্ণ মুখ; থুতনি আর গাল বুঝি একটু ঝুলে পড়েছে। এই কি তিনি? সর্বস্বহারার মতো?

হ্যাঁ, আজ থেকে সব শেষ। সত্যিই তো অফিস তাঁর সর্বস্ব ছিল! ওইখানে নিঃশ্বাস নিতেন, ওই জলে খেলা করতেন তিনি মাছের মতো।

একটা অপরিসীম শূন্যতা অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। যেন এইমাত্র খালি করে দেওয়া একটা বিরাট হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার ফাঁকা দেওয়ালগুলো ম্লান আলোয় বিবর্ণ। ধূলিহীন মেঝে, পরিষ্কার ছাদ। এই শূন্যতা যেন এক পাষাণের ভার। বুকটা কেমন করে, বুকে হাত দিলেন। হার্টের প্যালপিটেশনটা বাড়ল নাকি আবার? ডাক্তারকে কি খবর দিতে বলবেন? নাঃ, মাথা ঝাঁকালেন মিঃ চ্যাটার্জি, আজ নয়। শেষদিন আজ। কাউকে কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। বাঘা অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি এতদিন কর্মচারীদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে এসেছেন, নিজের মুখের ভাব একটুও বদল না করে; আজও সেই মুখোসটা এঁটেই দিন কাটিয়ে যাবেন।

মুখোস? কথাটা মনে আসতেই দুপা পিছিয়ে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। লোকে তাঁকে খারাপ অফিসার বলে, তাঁকে নাকি চেনা যায় না কখনো। এমন কি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত মাঝে তাঁর সম্বন্ধে নোট দিয়েছিলেন, সাব-অডিনেটদের সাথে ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট tactful নন।

এসব কথাতো শুনতেই হবে। বিশ্বস্তভাবে সরকারকে সেবা করবার এই ফল। সরকারের প্রতিটি হুকুম, প্রতিটি নিয়ম বর্ণে বর্ণে পালন করে আসবার চেষ্টা করেছেন তিনি সারাটা চাকরী জীবন ধরে। তার পুরস্কার তো এই হবে! কিন্তু কর্মচারীরা কেন তাঁকে এই দুর্নামটা দিল? তিনি কারো গাফিলতি সহ্য করেননি—কি অফিসার কি সাধারণ কর্মচারী—তাই কি এই দুর্নাম? হ্যাঁ, এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন, ফাঁকি দেবার সুযোগ দাও, তুমি ভালো। না দাও, অমনি মন্দ হয়ে গেলে। এই নিয়ম। আর দেশ স্বাধীন হয়ে এরা তো এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আজ মাইনে বাড়াও, কাল সার্ভিসরুল বদলাও—কি না সংবিধান বিরোধী! যত সব হুজুগ! উচ্ছৃঙ্খলতা! হ্যাঁ, উচ্ছৃঙ্খলতাই বলবেন তিনি একে! এ সবের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, ওসব এ্যাসোসিয়েসন মার্কা আন্দোলন কান্দোলন কড়াভাবে দমন করবার চেষ্টা করেছেন। কর্মচারীদের ভেতরে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা আনবার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় অফিসের efficiency. সুতরাং দুর্নাম তো তাঁর হবেই।

যাক, সুনাম দুর্নাম সবই আজ থেকে শেষ। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ভালো করে ধুয়ে নিলেন। তোয়ালেটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘাড় হাত মুছলেন। একপাশে সকালের জন্য গরদের কাপড় কোঁচানো রয়েছে। সাহেবীয়ানা পছন্দ করেন না চ্যাটার্জি, শুধু নামে আর অফিসের পোষাকে ছাড়া। সকালে সন্ধ্যাহ্নিক করেন। একটু প্রাতঃভ্রমণ, ফিরে এসে অল্প কিছু খেয়ে একটু অফিসের ফাইল পত্তর দেখা। তারপর যথারীতি অফিসের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এ নিয়মের কোনোদিন ভুল হয়নি। বন্ধুদের অনেকে বলেছে—সূর্য হয়তো একদিন না উঠতে পারে, কিন্তু চ্যাটার্জির অফিস কামাই! নৈব নৈব চ। জীবনের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নিয়মপালন করে এসেছেন তিনি। তাই জীবনে উন্নতি করেছেন। শরীরটাও ভালো রাখতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত।

দেরি হয়ে গেল নাকি আজ? গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। কি হয়েছে আজ! শুধু যত সব আবোলতাবোল ভাবছেন। না কি দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দুঁদে অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি দুর্বল, কথা শুনলেও যে লোকে হাসবে।

তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে নিলেন। খুট করে বাথরুমটা খুললেন। করিডর দিয়ে সুরমা যেন একটু দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন। একটু বুঝি থমকে দাঁড়ালেন। না! আমি কি বাথরুমে একটু দেরি করে ফেলেছি? অত্যন্ত সহজ চিরাচরিত ভঙ্গিতে দুইহাত আস্তে আস্তে দুলিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। আর মনে হতে লাগল, সুরমা বুঝি পেছন থেকে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাঁর মনের অলিগলি সব কিছু দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। মনে হল, আস্তে হাঁটতে গিয়ে যেন বড় বেশি আস্তে হাঁটা সুরু করেছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর।

তাড়াতাড়ি পুজো সেরে কাপড় পাল্টে, যেন অন্যদিনের মতোই যাচ্ছেন এমনি ভাব দেখিয়ে লাঠিটা এক পাক ঘুরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জী। দ্যাখো সুরমা কিছুই চেঞ্জ হয়নি আমার।

সামনে সকালের ঘুম ভাঙ্গা রাস্তা। জল ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে কিছু আগে। এখানে ওখানে ভেজা ভেজা জলের ছোপ। বাড়ি ঘরের ফাঁক দিয়ে সকালের হালকা রোদ ছোপ ছোপ জলের মতোই যেন রাস্তার নানা জায়গায় এসে পড়েছে। ঘাসে আঁটা লাইনের ওপর দিয়ে একটা ট্রাম চলে গেল বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে।

লাঠিটা একটু উঁচু করে ধরলেন মিঃ চ্যাটার্জী। ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন, তারপর দ্রুতপায়ে ঘাসে মোড়া ট্রাম লাইনটা পার হয়ে ওপাশের রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। কাল থেকে আমাকে রোজকার অভ্যাসমতো কিছু না করলেও চলবে। এবং অনেক কিছুরই ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু সকালের এই রোদ, তাঁর হাঁটা, সামনের ট্রাম লাইন, মাঝে মাঝে হেঁটে চলে যাওয়া লোকজন, কোন কিছুর মধ্যেই তো কোন ব্যতিক্রমের আভাস নেই। এমনকি ওই লেংচে চলা কুকুরটা পর্যন্ত যেন প্রতিদিনের মতোই একরকম। এরা কেউ বুঝতে পারছে না কত বড় একটা পরিবর্তন বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জী। এ মানুষটা আজ থেকে নতুন হয়ে গেল। না না, কাল থেকে।

মৃদু হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জী। হুঁ, দার্শনিকতা করছেন তিনি। এ রোগটা তাঁর আগে ছিল না কখনো। জীবন সম্বন্ধে, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, ভাবালুতা নিয়ে বা পুঁথি পড়া ফানুসমার্কা কতকগুলো ধারণা নিয়ে কোনোদিনই চিন্তা করেননি তিনি। চাকরীতে উন্নতি করতে হবে, নিখুঁতভাবে সব কাজগুলো

করতে হবে, এর চাইতে বড় কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, কোনোদিনই মাথায় উঁকি মারেনি তাঁর। এ যেন এক কুণ্ডলীপাকান সাপ নিদ্রাভঙ্গে পাক খুলে বেরিয়ে আসছে।

ভাবতেই শিউরে উঠলেন। কি বিচ্ছিরি চিন্তা! তাকাতেই চোখে পড়ল উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছেন অটলবিহারী সেন। ওয়ার্কস্ এ্যাণ্ড বিল্ডিংসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। পরনে পায়জামা। গায়ে পাতলা পাঞ্জাবি, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। বিরল কেশ, ফর্সা গোলগাল চেহারার প্রৌঢ়।

বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী, আজ যেন একটু দেরি হয়ে গেল না?

হ্যাঁ, এ কথা বলতে পারেন সেন সাহেব। অন্যদিন লেকের গেটে ঢুকবার মুখে দেখা হয়, আজ রাস্তাতে ওঁর ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল। মৃদু হাসবার চেষ্টা করলেন মিঃ চ্যাটার্জী।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। রাস্তার পাশের গাছগুলোও অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু পাতাগুলো উসখুস করে উঠল উড়ে যাওয়ার জন্য। আর টুপ করে একটা পাতা খসে এসে মিঃ চ্যাটার্জীর ঘাড়ের ওপর পড়ল। পাতাটা সরিয়ে দিতে দিতে মিঃ চাটার্জি ভাবলেন, খসে গেল একটা।

গাছের শেকড়ে-শেকড়ে যেমন আকাশের আলো আর হাওয়ার বার্তা অন্ধকারের মধ্যেও এসে স্পন্দিত হয় সেন সাহেব যেন অনুভব করছিলেন সেই ভাষাহীন প্রশ্নটি। চুরুটটা দাঁতে চেপে কাটা কাটা স্বরে হঠাৎ বললেন,—আমারও আর দুবছর।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকাতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। আমাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, না হঠাৎ নিজের ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়েছে সেন?

আরো দুটো বছর অফিসে যাবে সেন কর্তৃত্বের দণ্ড হাতে নিয়ে। এ কি কম সুখ? একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা শুঁয়োপোকার মতো মনের মধ্যে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। ওই পরিচিত মানুষটা এই মুহূর্তে অসহ্য। ও আমাকে সহানুভূতি দেখাতে চায়।

না, খুব ভুল করেছেন তিনি আজ বেড়াতে এসে। যার সঙ্গে দেখা হবে সেই একবার করে নীরব চোখের ভাষায় না হয় অতি ভদ্রতায় না হয় স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেবে, তিনি রিটায়ার করছেন আজ থেকে! যেন এক মৃতের জন্য শোক।

—আজ আর এগোব না। লাঠিটা ফুটপাতে ঠুকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটাজি।

—শরীরটা কি—একটু উদ্বেগ ফোটানোর চেষ্টা করলেন সেন তাঁর গলায়।

—না না! তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি,—শেষ দিন তো! কয়েকটা কাজ পড়ে আছে। সকালেই চুকিয়ে রেখে দেব। চলি।

জোরে জোরেই হাঁটছিলেন। হঠাৎ পা হড়কে যেতেই লাঠি দাবিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পায়ের তলায় গোবর। তীব্র বিরক্তিতে গা-টা রী-রী করে উঠল। এইতো কর্পোরেশনের কাজের নমুনা! মাইনে দিয়ে কর্পোরেশন থেকে এতগুলো ভিস্তিওয়ালা, মেথর, ঝাড়ুদার সব পুষছে, আর কি কাজ করছে তারা? ফাঁকি, স্রেফ ফাঁকি! অফিসের একগাদা কর্মচারীর মুখ হঠাৎ মনের মধ্যে ভীড় করে এল। আর মনে হল সেই মুখগুলোর কেউ এখনো তাঁকে কোনো ফেয়ারওয়েলের কথা বলেনি।

বাড়ি এসে ঢুকলেন। সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে ওপরে উঠে গেলেন। বাবু বেয়ারা লাঠিটা নিয়ে গেল হাত থেকে। বাড়ি এখন পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে।

জামা ছেড়ে গেঞ্জী গায়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকলেন মিঃ চ্যাটাজি। ঘর সাজানো হয়ে গেছে এরি মধ্যে। টেবিলে ফুলদানিতে টাটকা ফুল। একপাশে আজকের স্টেটসম্যান। খুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। সুরমা এখুনি এসে পড়বেন। ব্রেকফাষ্ট সেরে নিচে নেমে যাবেন তিনি। দুটো ফাইল আছে। উল্টে পাল্টে দেখতে হবে একটু। অফিসারটা বলেছিল বটে, সব ঠিক আছে। মুস্কিল, এদের যে বিশ্বাস করা যায় না। এদের ...দের কি মাথা মুণ্ডু আছে? তিনি নিজে না দেখে দিলে একটা না একটা গণ্ডগোল বাঁধবেই। অপদার্থ অফিসার অথচ ক্লিকবাজীতে খুব ...! ওর সার্ভিস হিষ্ট্রিটা তিনিও দাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কনফার্মড্ ... অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে। হাসলেন একটু।

...র কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। সুরমা আসছেন। ...ট্রে হাতে বেয়ারা। টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল।

—কি, হাসি হাসি মুখ যে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে যেন একটু ...লেন সুরমা। হালকা সুরে কথাটা বললেন।

—হাসছিলুম একটা কথা ভেবে। কাল থেকে নিশ্চিন্ত। আর কোনো

কাজ নেই, শুধু বুড়ো আর বুড়ী। খুব বেড়াব আর সিনেমা দেখব, ফুর্তিতে দিন কাটাব।

অকস্মাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কি কথা থেকে কি কথা যে চলে এল! অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামালেন। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল বড়।

পট থেকে চা ঢালছেন সুরমা। মুখটা একটু নিচু। একটা ছায়া। মাথার ওপরে পাখার মৃদু ঘূর্ণন। একটা টিকটিকি টক টক করে উঠল। স্তব্ধতা জিনিষটা কি কুশ্রী! অন্ধকারের মতো ভয়। আমার নির্জনতা বোধ হচ্ছে কেন?

—সমুর চিঠিটা কালও আসেনি। খুব মৃদুগলায় বললেন মিঃ চ্যাটার্জি—একটা cable করে দেব? বলতে বলতে বুকের মধ্যে কেমন হু হু করে উঠল। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল, একবার ছেলের মুখখানা কাছে থেকে দেখেন, দুদণ্ড ওর সঙ্গে বসে গল্প করেন। জেসপ-এর ইঞ্জিনিয়ার। কবেন্দ গেছে ছ বছরের ট্রেনিং-এ। এখনো ফিরতে মাস আষ্টেক। ইস, কতদিন যে দেখেননি!

স্বামীর দিকে তাকালেন সুরমা। একটা কান্না ঠেলে উঠে আসছিল। চায়ের কাপটা একটু ঠেলে দিলেন স্বামীর দিকে। চা টলমল করে উঠল। উপচে পড়বে বুঝি এখুনি। চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি।

—তাই দাও। মৃদুস্বরে বললেন।

—নাঃ, এবার ও ফিরে এলেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। যেন সামনে একটা মরুভূমি। এবং সেই মরুভূমির মধ্যে একটা ওয়েসিস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়িতে একটা বউ আসুক। হৈ হল্লায় ঘর ভরুক। শান্তি।

নিচু হয়ে চায়ে চুমুক দিলেন, নাঃ আজ বড় ধরা পড়ে যাচ্ছেন তিনি— কাজটুকু শেষ করে আসি। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

এবং সেই মুহূর্তে সুরমা বললেন—আজও কাজ? শেষ দিন না আজ? আজ তো শুধু ফেয়ারওয়েল তোমার।

কথাটা কানে ঢুকল এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন ঝনঝন করে উঠল। ফেয়ারওয়েল। শব্দটা যেন দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁর গলা চেপে ধরেছে। ডান হাতের তেলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। আজকের ভবিষ্যৎটা দেখবার চেষ্টা করছেন ওই হাতের মধ্যে দিয়ে।

ফেয়ারওয়েলের কথা শোনেন নি তিনি। কেউ বলেনি তাঁর কাছে এসে।

একটু উসখুস করলেন। না, ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারলেন না। সুরমা দুচোখে অদ্ভুত প্রত্যাশা ভরে নিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। স্বপ্নের ভেতরে এক মুহূর্তের মধ্যে যেমন জীবনের অনেকখানি অংশ ফুটে ওঠে, তেমনি এই মুহূর্তে মিঃ চ্যাটার্জি বুঝতে পারলেন, আজ সকাল থেকে এত ভাবনা সব কিছুর ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল ওই একটিই কথা। তাই সকালে উঠতেই ঘুলোনো ভাবে গা আচ্ছন্ন হয়েছে, স্ত্রীকে এড়াতে চেয়েছেন কথায় কথায় এবং রাস্তায় বন্ধুকেও।

তাঁকে কি তাহলে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে না? কিন্তু এতো একটা চিরন্তন প্রথা। রিটায়ার করবার সময় সহকর্মীরা ফেয়ারওয়েল দিচ্ছেন, নিজের জীবনেই তো কত দেখলেন তিনি। এর কি কখনো ব্যতিক্রম হতে পারে? না না, নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত হচ্ছে কিছু। বোধহয় কাছে আসতে ভয় পায় বলেই এখনো পর্যন্ত বলেনি কিছু। আজ বলবে।

মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে তুললেন। বললেন—তা বটে! আর, একটা কাঁটা খচ করে উঠল। অভিনয় করলেন নাকি? মিথ্যা হয় যদি? পাতলা অন্ধকারের কুয়াসা ঘেরা পর্দা বুঝি সামনে। তাহলে তো মিথ্যা বললাম। কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। ঠিক জানেন না তিনি। কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—তবু একটু আধটু কাজ করা ভালো। বলে আর কোনোদিকে না তাকিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

লম্বা করিডর। ঘাড় টান করে হাঁটছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। বাড়ি থেকে আজও অন্যদিনের মতো ঠিক সময়ে বেরিয়েছেন। ঠিক সময়ে এসে গাড়ি ঢুকেছে অফিস গ্যারেজে। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার এই করিডরে এসে পৌছেচেন।

নিরেবী পদক্ষেপে হাঁটছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাতদুটো আস্তে আস্তে দোলাতে দোলাতে, বুকটা সামনে চিতিয়ে রেখে আর পা দুটো সমান মাপে ফেলে ফেলে। ঠিক আর সব দিনের মতোই। মাথা উঁচু আর ঘাড় শক্ত করে। কারো দিকে সরাসরি না তাকিয়ে। বড় অফিসারকে এমনিভাবেই

হাঁটতে হয়। তাঁর এক শ্রদ্ধেয় উপরওয়ালা এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আজও বিশ্বস্তভাবে সেই উপদেশ অনুসরণ করে চলেছেন তিনি। হাঁটবার সময় পিয়নরা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতজোড় করে সেলাম বাজিয়েছে আর মাথাটা ঈষৎ নুইয়েই আবার সোজা করে হেঁটে চলে গেছেন। ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকা কর্মচারিদের হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠা মূর্তি চোখের আভাসের মধ্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেছে। করিডর, ঘর, সবকিছু অকস্মাৎ অত্যন্ত নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

হঠাৎই মনে হল, অফিসটা আজ যেন বড় জীবন্ত। এত চেঁচামেচি বা কথাবার্তা তাঁর হেঁটে যাওয়ার সময়তো এর আগে কখনো শোনেন নি। ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল। ওরা কি মনে করেছে, আজ ওরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে একেবারে? অজান্তেই ঘাড়টা একটু বেঁকে গেল। চারটি ছেলে একটা টেবিলের সামনে এসে জড়ো হয়েছে। হাত নেড়ে মুখ নেড়ে কি সব বলাবলি করছে। ওদের চোখও তাঁর চোখের সঙ্গে এসে মিশল এক মূহূর্তের জন্য। একটুক্ষণের জন্য, মনে হল, ওরা বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অথবা হয়তো তাঁর মনের ভুল। যেন তারপরেই ওরা জোর করেই বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে কথাবার্তায় মেতে উঠল। তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন। ওদের চোখে মুখে বেপরোয়া ভাবের সঙ্গে আর কি যেন মেশানো ছিল? ঘৃণা আর অবজ্ঞা কি? কঠিন সত্যের মতো মিঃ চ্যাটার্জির মনে একটা কথা চমক দিয়ে গেল। ওরা নিশ্চয় আজ ওদের মনের মতো একটা কিছু করে তাঁকে অপদস্থ করে ওদের সঞ্চিত গোপন ক্ষোভ এবং ঘৃণা মেটানোর চেষ্টা করবে। হুঁ, তাকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে না ওরা, নিশ্চয়! ওদের চোখে মুখে যেন এই কথাই লেখা ছিল।

হ্যাঁ, এই কর্মচারীরা তাঁকে ভয় করে এবং ভয়ের চাইতেও বেশী ঘৃণা করে। এ তিনি দেখেছেন। কিন্তু এর জন্য তিনি কি করতে পারেন? সরকারের কাজ। আদায়ের ভার তাঁর ওপর। তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তেমনি আদায়ও করে নিয়েছেন শক্ত হাতে। কথায় ছুটি চাইবে। কাজ বেশী বলে চ্যাঁচাবে। যেন সব সময়েই অত্যাচার চলছে ওদের ওপর এমন ভাব! দশটার সময় অফিসে কক্ষনো আসতে চাইবে না কি না, ট্রাম বাসের ভীড়ে উঠতে পারা যায় না! অফিসের প্রয়োজনে বাইরে বদলী করতে গেলে বলবে, এই অল্প মাইনেয় দু জায়গায় নাকি সংসার

চালানো যায় না। এদের যে কোনো অর্ডারেই অসন্তোষ আর ক্ষোভ। আর কথায় কথায় এ্যাসোসিয়েশনের নামে বায়নাক্কা। কিন্তু এসব অন্যায্য দাবিকে লাই দিতে গেলে কখনো শৃঙ্খলা থাকে, দক্ষতা বাড়ে? অতএব ওদের চোখে কিছু কড়া হতেই হয়েছে তাঁকে। দুর্নাম তো হবেই। ওদের চোখে তাই ঘৃণা! যেন কোনো অত্যাচারীর দিকে তাকিয়েছিল ওরা!

চাপরাশী ফ্যান খুলে দিয়ে গিয়েছে। টেবলের ওপরে সুদৃশ্য গ্লাসে জল শোভা পাচ্ছে সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া অবস্থায়। চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে নিয়ে বসলেন মিঃ চ্যাটার্জি। দেয়াল ঘড়িটায় টিক্‌টিক্ শব্দ উঠছে। জানলার কাটা পর্দায় বাইরের হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে। শুধু সুইং ডোরটা স্থির।

কি পরিচিত ঘর! কতদিন কাটালেন এখানে? চার বছর! এর আগে ছিলেন অন্য অফিসে। শেষ প্রোমোশন পেয়ে এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। এই ঘর থেকেই বিদায় নিতে হবে।

ঢাকনা নামিয়ে গেলাশটা তুলে নিলেন। এক চুমুক জল খেয়েই নামিয়ে রাখলেন। কে যেন সুইংডোর ঠেলছে। চমকে তাকালেন। রামু পিয়ন।

—কে? ভ্রূ উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ্ঞে হীরেন বাবু দেখা করতে চান।

—হীরেন বাবু। কথাটা বললেন আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরের স্নায়ুগুলো যেন টানটান হয়ে উঠল। এ্যাসোসিয়েশনের লীডার! ফেয়ারওয়েলের কথা বলতে আসছে নাকি? একটা উদগ্র আগ্রহ আর কামনায় চনমন করে উঠলেন। বললেন—আসতে বলো।

রামু বেরিয়ে গেল। সুইংডোর ঠেলে ঢুকল হীরেন চ্যাটার্জি। একই সঙ্গে অফিসিয়াল গাম্ভীর্য এবং কিছুটা ভদ্রতা ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। একটু ঝুঁকে পড়লেন টেবলের ওপরে। কাঁধদুটো সঙ্কুচিত করলেন। পেন হোল্ডার থেকে একটা কলম তুলে নিলেন হাতে।

—কি ব্যাপার?

হীরেন চ্যাটার্জি এগিয়ে এল কয়েক পা। মাথার চুলে আলতোভাবে বাঁহাতটা একবার বুলিয়ে নিল।

—আপনিতো আজ থেকে চলে যাচ্ছেন।

বুকটা ধক্ করে উঠল মিঃ চ্যাটার্জির। এইবারে বুঝি ফেয়ারওয়েলের কথা বলবে!

—কিন্তু স্মরজিৎ সরকারের ট্রান্সফারের ব্যাপারটাতো এখনো ফয়সালা হল না।

এই কথার জন্য এসেছে? একটা অক্ষম রাগে চোখমুখ ঝাঁঝাঁ করে উঠল। মনে হচ্ছিল, এখুনি ডানহাতটা তুলে দরজাটা দেখিয়ে দ্যান। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম ভয় বাধা দিচ্ছিল। ও যেন একমুহূর্তেও একলা নয়। ওর চোখের পেছনে দুশো কর্মচারীর চোখ তীব্র খোঁচা মারছে। ওর গলায় দুশো মানুষের গর্জন। কেমন যেন ভয় লাগে। অকারণ স্নায়বিক ভয়। আর এর জন্যই একটা তীব্র অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকেন। শিরশিরে ভয়ের ভাবটা স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে যাচ্ছে। শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছে, চোখের কোণে রক্ত জমছে, কানের দুপাশে টিপটিপ ভাব সুরু হয়েছে। একটা অক্ষম রাগে আর ভয়ে জড়ভরতের মতো হীরেন চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

—আপনিই বলেছিলেন, বড় অফিস থেকে কেউ এসে এখানে জয়েন করলেই স্মরজিৎকে ব্রাঞ্চ থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়ে আনবেন। তা, লোক তো আজ জয়েন করেছে। এবারে স্মরজিতের ফিরিয়ে আনবার অর্ডারটা দিয়ে দিন।

—এমন কথা কি আমি বলেছি? চাপা ক্রোধে ফুলতে ফুলতে উত্তর দিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ইচ্ছে করে প্যাঁচ কষা আমার ওপরে!

—হ্যাঁ, আমি বেশ স্মরণ করতে পারছি। এমনি ধরণের মৌখিক আশ্বাসই এর আগে আপনি আমাদের দিয়েছিলেন। এবং আপনার সেই প্রতিশ্রুতির জন্যই ট্রান্সফারটা টেম্পোরারী হয়েছিল।

—কিন্তু এমন কথা বলিনি, যে মূহূর্তে কেউ জয়েন করবে, সঙ্গে সঙ্গে স্মরজিৎ সরকারকে ফিরিয়ে আনবার অর্ডার দেব। মনে রাখবেন, তাঁকে পাবলিক ইণ্টারেষ্টে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া আপনাদের বন্ধুদেরই অপ্রয়োজনীয় ছুটি নেবার ফলে ব্রাঞ্চে যে এরিয়ার পড়েছে, সেটা pull up করবেটা কে? চেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। একটু স্বস্তি পেলেন। যাক প্যাঁচ দিয়েছেন একটা এতক্ষণে।

—প্রথমত ছুটি অপ্রয়োজনে কেউ নেয় নি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই তাই হয়েছে, তাহলেও তার জন্য একটা নিরপরাধ ব্যক্তি suffer করতে যাবে কেন? তাছাড়া, আপনার প্রতিশ্রুতির একটা গুরুত্ব আছে

এটা কি আমরা আশা করতে পারি না? হীরেন সোজা তাঁর দিকে তাকাল। কি বিনীত ভঙ্গি অথচ কি দুর্বিনীত? অসহায়ের মতো একটা তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। নাঃ, এখানে আসার পর থেকে এই এ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডাগুলো জালিয়ে এসেছে তাঁকে, আজ শেষ দিনেও ছাড়বে না।

—আমার এখন আর কিছু করবার নেই। যিনি নূতন আসছেন আমার জায়গায়, প্রয়োজন বুঝে তিনিই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন।

—ঠিক আছে! কেমন একটা ইঙ্গিত সহকারে কথাটা বলে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল হীরেন চ্যাটার্জি।

কপালে বুঝি ঘাম দেখা দিয়েছে। প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাত কাঁপছে নাকি একটু একটু?

রক্তের মধ্যে একটা অস্থির চাঞ্চল্য জাগছে। আর এক অদ্ভুত ভয়। যা কোনোদিন করেন না, আজ তাই করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অস্থির পায়ে পায়চারী শুরু করলেন ঘরের মধ্যে। খাঁচায় পোরা সিংহের মতো। এই মূহূর্তে বাইরে বেরুবার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। যেন, শত শত কর্মচারীর জোড়া জোড়া চোখ ঘৃণা আর আক্রোশ নিয়ে দরজায় দরজায় পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণ বর্শার মতো বিঁধিয়ে দেবে তিনি বাইরে গেলেই।

কয়েকবার পায়চারী করে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে। লজ্জা লাগল। কেন এত ভয় পাচ্ছিলেন? ছিঃ! যা করেছেন তিনি, সবই তো কর্তব্যের খাতিরে। বাইরে যেতে কেউই চায় না। কিন্তু সরকারী স্বার্থ দেখতে গিয়ে জোর করেই পাঠাতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাতে গেলে অফিস চলত না। যারা ছুটি নিয়েছে, অনেককে মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছেন, সত্য সত্য অসুখ কি না পরখ করবার জন্য। ক্যারেক্টার রোল খারাপ করেছেন অনেকের, ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। অযোগ্য লোকগুলোর শাস্তি হওয়াই তো উচিত। অথচ এই সব ব্যাপার নিয়ে এ্যাসোসিয়েশন হৈ চৈ করবার জন্য মুখিয়েই রয়েছে। করুকগে হৈ চৈ। ডিসিপ্লিন বজায় না রাখলে অফিস কবে চলিয়ে যেত। এর জন্য তাঁকে কৈফিয়ৎ তলব করতে হয়েছে, চার্জশীট

করতে হয়েছে। একজনের চাকরীও খেয়েছেন। এবং এ সবই অফিসের দক্ষতা ও মান বজায় রাখবার জন্য। তাই তিনি অত্যাচারী এবং হিংসাপরায়ণ অফিসার! ওদের ঘৃণার পাত্র!

কিন্তু তাহলে তিনি অনর্থক ভয় করেন কেন? নাকি তিনিও মনে মনে বিশ্বাস করেন যে হাতে অপরিমিত ক্ষমতা পেয়ে দুর্বলের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে এসেছেন এতকাল?

মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি চিন্তাগুলো। নাঃ, এখন প্রস্তুত হতে হবে। কলিং বেল টিপলেন। পিয়ন এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

—দত্ত সাহেব।

ও সেলাম করে চলে গেল।

চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

সুইং ডোর ঠেলে দত্ত সাহেব ঢুকলেন। সাবঅর্ডিনেট অফিসার। মাঝ বয়েসী লোক। ব্যক্তিত্বহীন। নিজের টাই ঠিক করতে করতেই গলদঘর্ম। দেখলে গা জালা করে। একটা ডিসিসন যদি ঠিকমতো দিতে পারে!

—চার্জ হ্যাণ্ডওভার রিপোর্ট রেডি করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দত্ত সাহেব টাইতে আঙুল বোলালেন।

—নিয়ে আসুন। দেখি, আপনাদের কাজ তো! কি করতে কি করে বসে আছেন কে জানে? মৃদু বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল।

নিরীহ পশুর ভঙ্গিতে কেমন দাঁড়িয়ে আছে! শুধু টাই টানাটানি করছে! সত্যি, চাবুক মারলেও বোধহয় এমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই সব সহ্য করবে!

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কথাটা কি বুঝতে পারেন নি? তীক্ষ্ম গলায় বললেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—আজ্ঞে সার। এই যে যাই। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দত্ত সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

—অপদার্থ। স্কাউণ্ড্রেল! অস্ফুটে মন্তব্য করলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

যে অক্ষম আক্রোশ মনের মধ্যে এতক্ষণ মাথা ঠুকে ঠুকে মরছিল, ওই লোকটার ওপর দিয়ে তার খানিকটা উদ্গীরণ হয়ে যেতে কিছুটা শান্তি পেলেন যেন।

দত্ত সাহেব চার্জ হ্যাণ্ডওভার রিপোর্ট দিয়ে গেলেন। তার ওপরে চোখ বোলাতে লাগলেন মিঃ চ্যাটার্জি। এতে একটা সই করলেই, ব্যাস, তাঁর মুক্তি।

ফোনটা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন—হ্যালো!

—হ্যালো! আমি কি মিঃ চ্যাটার্জির সাথে কথা বলছি?

—হ্যাঁ। কে?

—আমি বিভাস অধিকারী কথা বলছি।

হাতটা একটু কেঁপে গেল অজান্তেই। তাঁর সাকসেসর!

—আচ্ছা! কখন আসছেন? গলায় কেমন একটা বাধো বাধো ভাব বোধ করছিলেন।

—খুব বেশী হলে আধঘণ্টার মধ্যে। কেমন?

—ঠিক আছে।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—থ্যাঙ্কস্।

অসাড় হাতে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

ঘড়িটার দিকে আপনমনেই চোখ গিয়ে পড়ল। একটু একটু করে কাঁটা সরছে। একটু একটু করে যেন তাঁকে সরিয়ে দিচ্ছে চেয়ারটা থেকে। আর একটু পরেই মিঃ অধিকারী আসবেন। চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া, রিপোর্ট সই করা। ব্যস। খালি হাতে গিয়ে উঠবেন গাড়িতে। নিঃশব্দে ফিরে যাবেন বাড়িতে। সুরমা শুধু বড় বড় চোখ মেলে তাকাবে একবার তাঁর মুখের দিকে, একবার গাড়ির দিকে। কি আনলেন অফিস থেকে, শেষ দিনটায় সহকর্মীদের প্রীতি উপহার হিসেবে, বুঝি হিসেব করে বুঝে উঠতে চাইবেন।

অথচ কোনোদিনই তো প্রীতি চাননি মিঃ চ্যাটর্জি অফিস থেকে। এখান থেকে তিনি চেয়েছেন কাজ। দক্ষতা আর নিয়ম শৃঙ্খলা। আজ কেন তাহলে প্রীতির কথা উঠছে।

ভাবতে ভাবতে কখন মাথায় হাত রেখেছেন, জানলার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন, জানেনই না মিঃ চ্যাটার্জি। হঠাৎ চমক ভাঙল চাপরাশীর মৃদু ডাকে।

—হুজুর!

ঈষৎ চমকে মুখ ফেরালেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—নিচে নয়া হুজুরের গাড়ি এসেছে।

—তাই নাকি! তুমি গিয়ে তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো। আচ্ছা চলো, আমিই যাচ্ছি। বলে উঠে দাঁড়ালেন।

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গটগট করে করিডর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

—হ্যাল্লো!

—হ্যাল্লো!

দুজনে করমর্দন করলেন—আসুন। চ্যাটার্জি আহ্বান করলেন তাঁর উত্তরাধিকারীকে।

চকচকে স্যুট আর কম্বিনেশন টাইতে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে অধিকারীকে। বয়েসও অনেক কম। অনেক উন্নতি করবে জীবনে। মিঃ চ্যাটার্জি ভাবলেন।

ঘরে এসে ঢুকলেন দুজনে।

আর নয়, এবারে পালা চুকিয়ে ফ্যালো চ্যাটার্জি। মনে মনে যেন নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

অফিসারদের ডাকলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তারপর কাগজ পত্তরগুলোয় সই শেষ করে যখন উঠে দাঁড়িয়ে দুজনে করমর্দন করলেন, বেলা তখন প্রায় একটা।

এখন আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোক। মনে মনে আওড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। আর সিনিয়ার অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি নই।

ভাবলেন, আর ভয়ংকর একটা শূন্যতার চাপে মনটা যেন অবশ হয়ে এল। তারপর সেই চাপটা হঠাৎ উঠে গেল আর নিজেকে কি ভীষণ হালকা মনে হল! বুকটা বুঝি একটু ধকধক করছে। চারিদিক তাকালেন। মনে হল, যেন এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে। একটু আগেই নিজের হাতে তাঁর রাজ্যপাট সব কিছু অন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন মঞ্চ ফাঁকা। তাঁর অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। এবারে উইংসের আড়ালে চিরতরে প্রস্থান।

সইটার দিকে তাকালেন। পেছনের দিনগুলো আর আগামী দিনগুলোর মধ্যে এই শেষ সই যেন তীক্ষ্ণধার অসির মতো সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন থেকে তিনি একজন ভূতপূর্ব অফিসার।

গা ঝাঁকানি দিলেন। আর নয়। এবারে চলে যাই। এই ঘর, এই টেবিল, আলো, জানলার পর্দা, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, কার্পেট, সব মিলিয়ে এই জগৎটা যে কত অসংখ্য অদৃশ্য টানে তাঁর সমস্ত সত্তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ঠিক এই মুহূর্তে যখন পড়্‌পড়্‌ করে সমস্ত শিকড়ে টান পড়ল, যেন বুঝতে পারলেন। মরবার সময় কি মানুষের এমনি যন্ত্রণাই হয়?

—আর নয় মিঃ অধিকারী। এবারে উঠছি।

—সেকি, এখনি চলে যাবেন? ফেয়ারওয়েল কি এরি মধ্যে হয়ে গেছে নাকি? অত্যন্ত নির্দোষ বিস্ময়ে প্রশ্ন করে অধিকারী সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আর যেন পাহাড় থেকে একটা বিরাট পাথরের চাঁই হুড়মুড় করে গড়িয়ে এসে মিঃ চ্যাটার্জির ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ল। সুরমার মুখ চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, অফিসের কর্মচারীদের অদ্ভুত চোখগুলো। সমস্ত সার্ভিস লাইফের সার্থকতা কি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এই একটি শব্দের যাদুর মধ্যে! ফেয়ারওয়েল? এর সঙ্গে বুঝি নিজের সম্মান, পরিবারের সম্মান সব কিছু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। অস্তিত্বের একটা বৃহৎ অংশের মতো।

সেই অস্তিত্বের ওপরেই বুঝি মিঃ অধিকারী আঘাত করেছেন না বুঝে।

কয়েক পলক ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পৃথিবীটা দুলছিল, চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মুখ তুলেই বলে ফেললেন—নাঃ, আমি বারণ করে দিয়েছি।

কথাটা বলে ফেললেন আর হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ যেন মুহূর্তে দীর্ণ করে ফেলল তাঁকে। ঠিক তখনি, বিদ্যুৎঘাতে আলোকিত আকাশ মাটি গাছপালার চকিত প্রকাশের মতো বুঝতে পারলেন, কি যন্ত্রণায়, কি কঠিন প্রয়োজনে তাঁর কর্মচারীরা মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা বলে থাকে।

আর দাঁড়ালেন না। সেই মুহূর্তেই মিঃ অধিকারীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ভূতে তাড়া করা মানুষের মতো দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। অফিস ঘরের দরজাগুলো সট সট করে সিনেমার ছবির মতো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। হন হন করে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। যেন অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকোতে পারলে বাঁচেন। অফিস কম্পাউণ্ড ছেড়ে মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি রাস্তায় এসে পড়ল।

আর সব কিছু শেষ হয়ে গিয়ে একটা চিন্তাই সিনেমার পর্দায় ক্লোজ-আপ মুখের মতো বড় হতে হতে সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কি করে খালি হাতে স্বরমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন! দুহাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো পেছনের সীটে পড়ে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। কি করবেন? কি? মাথার মধ্যে ভোমরার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন যেন।

অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—সতীশ, গাড়ি ঘোরাও। নিউমার্কেট। বিস্মিত সতীশ গাড়ি ব্রেক কষল। তাঁর দিকে একবার তাকাল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

প্রখর রৌদ্রে রাস্তা জ্বলছে। ট্রামগুলো ক্লান্ত গরুর মতো যেন গলার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। ল্যাম্পপোষ্টের শীর্ণ ছায়ায় একটা কুকুর বিশ্রাম করছে। চারপাশে শুধু বিবর্ণ কর্মহীনতার মেলা।

নিউমার্কেটের মুখে এসে গাড়ি থামল। নেমে ভেতরে এসে ঢুকলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঘুরে ঘুরে একটা চাদর কিনলেন, একটা ছড়ি, গীতা একখানা। তারপর ফুলের স্টলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মালা দেখি একটা।

পছন্দ করে সাদা ফুলের একটা মালা কিনলেন। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে এসে গাড়ির মধ্যে একপাশে সাজিয়ে রাখলেন জিনিষগুলো। নিজে উঠলেন।

সতীশের অবাক দৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু বললেন—চলো, বাড়ি।

মাথা উঁচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। মাথা উঁচু করেই আবার ঢুকবেন। তার জন্য যত মূল্যই দিতে হোক না কেন।

গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে গাড়ি দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে জিনিষগুলো বের করে নিলেন। সতীশ হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল জিনিষগুলো। বললেন—দরকার নেই। গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাও।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

সাড়া পেয়ে রামু চাকরটা এগিয়ে এল।—ধরো। বলে সব জিনিষ দিয়ে দিলেন ওর হাতে। ফুলের মালাটা ছাড়া।

শব্দ পেয়ে স্বরমাও বেরিয়ে এসেছেন। চোখাচোখি হল। জিনিষপত্তরের দিকে নজর পড়ল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

—ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল তাহলে?

—হুঁ। বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে অর্ধস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন।

—এগুলো দিল বুঝি?

—হুঁ।

—বাঃ! গীতা, চাদর, ছড়ি! তোমার কর্মচারীদের বেশ রসবোধ আছে তো?

—খুব।

বুকের মধ্যে আবার সেই সকালের যন্ত্রণার ভাবটা যেন চাড়া দিয়ে উঠছে। কিছু বাতাস নেবার জন্য হাতের মুঠো আলগা করে আবার শক্ত করলেন।

—ওকি, তোমার মুখটা অমন শাদা হয়ে গেল কেন? উদ্বিগ্ন হয়ে স্বরমা এগিয়ে এলেন—শরীর খারাপ করছে।

—না, না! দুপুরে চলে আসতে হল কিনা? অভ্যাস তো নেই! জোর করে হেসে উঠতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জী।

আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরমার চোখে আবার চোখ মিলল।

আমি সব মিথ্যে কথা বলছি। বুঝতে পারছ না? চেঁচিয়ে বলে উঠতে গেলেন। কিন্তু কে যেন গলাটা কামড়ে ধরে আছে। আহত পশুর মতো আর্ত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

আলোচনা

সুশোভন সরকার

শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নিয়ে বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনা নিশ্চয়ই একটা শুভলক্ষণ। এই আলোচনায় সকলে যে একমত হবেন না এটা তো স্বাভাবিক। এখানে শেষ কথা কিছু থাকতে পারে না, সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা নেই, গোষ্ঠিগত নীতিও অচল। আমার রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নব-জাগরণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপত্তি তাই অপ্রত্যাশিত নয়। আমি যাকে প্রাচ্যাভিমান বলেছি, আজকের দিনে তার বিশিষ্ট ধারকেরা যে আমার উপর খড়্গহস্ত হবেন তাতে গোড়া থেকে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য হলাম শারদীয় পরিচয়ে হীরেনবাবুর ক্ষোভ ও উষ্মা দেখে, যেহেতু আমার সংজ্ঞায় যেটা প্রাচ্যাভিমান, রবীন্দ্রনাথ যাকে বার বার আক্রমণ করেছিলেন (তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতিগুলি এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ), হীরেনবাবুকে তার আওতায় আনতে আমি অক্ষম।

আমার প্রবন্ধের মতামত "ভ্রান্ত", "নিষ্প্রাণ", "যান্ত্রিক", "একদেশদর্শী", "অসঙ্গত", "সংকীর্ণ", "অবাস্তব" কিনা সেকথা নিশ্চয়ই তর্কসাপেক্ষ। এরকম বিশেষণ প্রয়োগ আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন, কেন না বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকেরাই কেবল তর্কের নিষ্পত্তি করতে পারেন। আমি এখানে চেষ্টা করব শুধু ভুল বোঝার অবকাশটুকু কমিয়ে আনতে।

কারণ, মনে হয় এ-প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, ইংরাজিতে যাকে বলে arguing at cross purposes. দোষ অনেকটা নিশ্চয় ছিল ভাষা প্রয়োগে ও ভাবপ্রকাশে আমার দুর্বলতার মধ্যে। কিছুটা দায়িত্ব বোধহয় সমালোচকেরও আছে।

দুটি সামান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। হীরেনবাবু বলেছেন যে আমি সিদ্ধান্ত করেছি: "মোটামুটি ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় চলেছিল প্রাচ্যাভিমানের পর্ব"—আর আমার প্রবন্ধে "বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা নেই।" অথচ আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যাভিমান-বিরোধী উক্তি

দিয়েছিলাম অল্প কিছু একেবারে আদিপর্বের লেখা থেকে, আর ১৮৮৬—১৮৯৮ সালের রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে। "বহিরঙ্গ-চিহ্নগুলি যে পশ্চিমী দৃষ্টির আসল পরিচায়ক নয়", বিদ্যাসাগরের মধ্যে তার প্রমাণ দেখেছিলাম, মূল্যায়নে তাঁকে রামমোহন ও মধুসূদনের সমগোত্রীয় মনে করেই। এর থেকে অনুমান হতে পারে যে হয়ত সমালোচক মূল প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত ভালো করে পড়ে দেখেন নি।

কিন্তু আসল গোলমাল বেধেছে প্রবন্ধে ব্যবহৃত দুটি পারিভাষিক শব্দ নিয়ে, পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমান। নূতন concept প্রয়োগে সর্বদাই মুশ্‌কিল দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লেখকের নিজস্ব ধারণাটুকু নির্ভুলে বুঝবার চেষ্টা করাটা বাঞ্ছনীয়, নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরে যাওয়া অনুচিত।

সমালোচকেরা পশ্চিমী দৃষ্টির অর্থ করেছেন ইওরোপ-প্রীতি, প্রতীচ্যের কাছে আত্মসমর্পণ, নির্বিচারে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি গ্রহণ, হাতজোড় করে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকা। তাঁদের কাছে প্রাচ্যাভিমানের মানে দাঁড়িয়েছে—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, চিন্তায় ও কর্মে স্বদেশী মাটির মূলগত প্রাধান্য, দেশের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক, এককথায় হীরেনবাবুর "ভারত-বোধ"। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা স্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পশ্চিমী দৃষ্টির অনুসন্ধান বৃথা, রামমোহনের মতোনই "পশ্চিম তাঁহাকে কখনই অভিভূত করে নাই।" এই সংজ্ঞা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রাচ্যাভিমানী, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি ও বিশ্বাস অবিসম্বাদিত। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, কোনও বড় সাহিত্যিক দেশের মাটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তিনি প্রকাশ করেন নিজের ভাষাতে, স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকবেই। প্রকৃত দেশপ্রেমিক নাড়ীর সম্পর্ক কাটাতে পারেন না। দেশ সম্বন্ধে তাঁর 'বোধ' থাকতে বাধ্য। আমি এতটা অর্বাচীন নই যে সর্বজনগ্রাহ্য এইসব কথা অগ্রাহ্য করব।

প্রকৃত প্রশ্ন হল যে আমার প্রবন্ধের মূল শব্দদুটির অর্থ কি এই ছিল? সেখানে কি বলা হয়নি যে নব-জাগরণের সাহিত্যশিল্প-সৃষ্টি ও স্বাদেশিকতা "সমানে পুষ্টিলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে"? প্রাচ্যাভিমান থেকে রবীন্দ্রনাথের মুখ ফেরানোর অর্থ তাঁর ভারতবোধকে অস্বীকার করা, এই বা কেমন কথা? যে-রামমোহনের প্রতিষ্ঠা 'ভারত-পথিক' রূপে, তাঁকে পশ্চিমী দৃষ্টির প্রবর্তক হিসাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হল কি করে?

প্রবন্ধের পারিভাষিক শব্দের মধ্যে 'দৃষ্টি' ও 'অভিমান' কথা দুটির প্রয়োগ আকস্মিক নয়। পশ্চিমী দৃষ্টির প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রাচ্য দৃষ্টি অর্থাৎ ভারতবোধ, প্রাচ্যাভিমানের বিপরীত হিসাবে পাশ্চাত্ত্যাভিমান অর্থাৎ পশ্চিমীকরণকে উপস্থিত করা হয়নি সুকল্পিতভাবেই। Westernism এবং westernisation সমার্থক নয়। সমালোচক যোগ্যতর পারিভাষিক শব্দের প্রস্তাব আনতে পারতেন, তাতে অবশ্য প্রবন্ধের বক্তব্যটুকু বদলে যেত না।

পশ্চিমী দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত নয়, ইতিহাসের বিশেষ যুগে পশ্চিম থেকে আহরিত আদর্শ মাত্র। উনিশ শতকে বাংলা দেশে এই দৃষ্টি বাস্তব রূপ নিল সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবিকবাদে। (হিউম্যানিজমের এই প্রতিশব্দের জন্য আমি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে ঋণী—শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর লেখাটি সকলের পড়া উচিত)। তেমনই প্রাচ্যাভিমানের প্রকৃত অর্থ আপন ঐতিহ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাদেশিকতা, ভারতবোধ নয়। তার বাস্তব প্রকাশ হয়েছিল প্রাচীন গৌরবের 'উপাসনা' অর্থাৎ ঐতিহ্যকে নির্বিচারে সংরক্ষণের ঝোঁকে, ভারতের বিশেষ অবস্থায় হিন্দুত্ববোধের প্রাধান্যে, যুক্তিকে হটিয়ে ভক্তিপ্রবণতার স্রোতে। আমার প্রবন্ধে ছিল উভয় ধারার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা। উভয় ধারারই কিছু কিছু প্রকাশ সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের লেখায় ধরা পড়ে। কিন্তু কোনো কোনো পর্বে, বিশেষত পরিণত জীবনের শেষার্ধে পশ্চিমী দৃষ্টির প্রাবল্য লক্ষ্য করা সম্ভব, আমার বক্তব্য ছিল এই। প্রমাণ হিসাবে প্রবন্ধে তারিখ-সম্বলিত বহু উদ্ধৃতি কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রায় প্রতিটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের পার্থক্য ও প্রকৃত স্বরূপ। উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি করে এই লেখার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

পশ্চিমী দৃষ্টি বিদেশী শাসক, প্রচারক বা লেখকের চোখে "ভারত দর্শন" নয়। ইতিহাসে যাকে western impact বলে তার থেকে সঞ্জাত, বাংলার রেনেসাসের যুগে নূতনভাবে রূপায়িত দেখবার ভঙ্গিটাকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ দৃষ্টির location এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে, বিদেশে কিংবা ব্রিটিশের "বদান্যতা"র মধ্যে নয়—একে made in Europe বললে চলে না। পক্ষান্তরে "যাঁরা সদাই পিতামহের কালে বাসা বাঁধেন" এদেশীয় তাঁদের প্রবন্ধ নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় প্রাচ্যাভিমানী বললে অন্যায় হয় না। তাঁরা কিছু

অশ্রদ্ধেয় নন, তাঁদের প্রভাবেরও ঐতিহাসিক কারণ ও তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু তাঁদের তুলনায় প্রথম ধারাকেই "ভবিষ্যতের উপযোগী" মনে করাটা কি এতই অস্বাভাবিক ?

পশ্চিমী দৃষ্টি সাহেবিয়ানা নয়, ইংরাজিকে শিক্ষার বাহন হিসাবে আঁকড়ে থাকা নয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আত্মনিমজ্জন নয়, ব্রিটিশ শাসনের স্তব নয়, ইওরোপের শক্তিরূপের আরাধনা নয়, দেশ ও দেশবাসীকে হেয়জ্ঞান করা নয়, অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, ভারতীয় সরল শান্ত জীবন জীবনযাত্রাকে বিসর্জন দেওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তিকে আমি পশ্চিমী দৃষ্টির প্রকাশরূপে চিহ্নিত করেছি, তার থেকেই কি একথার প্রমাণ মিলবে না ? অথবা সেই সব লেখাতে কি সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদের উজ্জ্বল দীপ্তি নেই ? শেষের দিকে এই ঝোঁক প্রবলতর হয়ে ওঠার নিদর্শনকে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা বলতে এত আপত্তি কেন ? আপত্তি তখনই ওঠে যখন পশ্চিমী দৃষ্টিকে এমন অর্থ দেওয়া হয়, যে-অর্থ আমার প্রবন্ধে ও নির্বাচিত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে না।

কথা উঠতে পারে পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানকে বিপরীত ধারা বলবার সার্থকতা কোথায়। উনিশ শতকের নব-জাগরণের চিন্তায় দুই বিরোধী ধারার বাস্তব অস্তিত্ব অনেকেরই চোখে পড়েছে। আমি শুধু তাদের উনিশ শতাব্দীর রুশদেশে চিন্তা-সংঘাতের তুলনীয় ভেবে সংক্ষিপ্ত দুটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছি। কেউ কেউ এদের রেনেসাঁস ও রিভাইভালিজম্ বলেছেন। আমার মতে দুটিই আমাদের নব-জাগরণের অঙ্গ। আমি বলেছি দুই ধারার বিরোধ এদেশে প্রধানত গোষ্ঠীগত ছিল না, একই লোকের মনে উভয় ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। আমি রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দুই ধারারই প্রকাশ খুঁজেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর লেখায় পর্বভেদের অনুসন্ধান করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত একটির উপর অপরটির জয়যাত্রার নির্দেশ পেয়েছি। নব-জাগরণের যুগে চিন্তার রাজ্যে অন্তর্বিরোধ আমার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়েছে। হীরেনবাবু তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযোদ্ধার মতো সংঘর্ষ বলে উপহাস করেছেন। দুই ধারার মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের অস্তিত্ব অর্থাৎ inter-penetration নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাতে করে অমূর্ত ধারণার দুই ঝোঁকের বিরোধের অবসান হয় না। আর সেই পরস্পর-সম্পর্ককে সমন্বয়সাধন বলে নিশ্চিন্ত থাকবারই বা অবসর কোথায় ?

একথা বলবার কারণ এই যে আমার মতে উনিশ শতাব্দীর বিরোধের সমন্বয় সম্পন্ন হয়ে ওঠে নি, আজকের দিনে বরং বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। পশ্চিমী দৃষ্টিকে যদি সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদ হিসাবে দেখি, তাহলে এখনও পদে পদে এই পথে যে-বাধা উঠছে তার উৎসও পাই সেই প্রাচ্যাভিমানে, যার আদর্শ হল ঐতিহ্য সংরক্ষণ, যার অবলম্বন হল ভক্তিস্রোতে অবগাহন, যার অস্ত্র হল হিন্দুত্ববোধের বুলি। শেষ বিশ্লেষণে অবশ্যই এখানে বাস্তব শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, চোখে পড়বে কায়েমী স্বার্থের প্রেরণা। কিন্তু বিরোধ প্রকাশিত হয় ভাব-রাজ্যে—ইডিয়লজির ক্ষেত্রে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত রূপ নেয় আদর্শের সঙ্গে আদর্শের বিরোধে। আজ কোথায় গেল উনিশ শতকের সেই সুবিখ্যাত সমন্বয়সাধন?

অনেকের কাছে শুনতে পাব, এ তো হল রবীন্দ্রনাথকে দলে টানবার স্বার্থপ্রসূত অভিসন্ধি, অতএব সাধু সাবধান। এঁদের দুর্ভাগ্যবশত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বার বার নানা ব্যাপারে partisan রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করেন নি, বলিষ্ঠ মতামত প্রচারের ব্যাপারে সমন্বয় খোঁজেন নি। তাঁর সেই উত্তরাধিকার আজ যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে কি অন্যায় হবে?

হীরেনবাবুর প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মন্তব্যের আলোচনা করে এ লেখা শেষ করি।

আমার প্রবন্ধ-খণ্ডন মূল উদ্দেশ্য হলেও তিনি লেখা শুরু করেছেন বুদ্ধদেববাবুকে আক্রমণ করে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি আমাদের দুজনকে এক পর্যায়ে ফেলছেন। অথচ আমার মতে পার্থক্য সুদূরপ্রসারী। বুদ্ধদেববাবুর লেখা হাতের কাছে নেই, কিন্তু তাঁর অন্তত দুটি ইঙ্গিত আমার কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। স্বীকার করি না যে রবীন্দ্রনাথের যুগে এদেশের প্রায় অখ্যাত ফরাসী কবিদের কাব্যপ্রতিভা সাময়িক পত্রে অথবা মুখে মুখে আকাশে বাতাসে বিচ্ছুরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁর মতো প্রতিভাধরের পক্ষে প্রজ্জ্বলিত হতে এই স্ফুলিঙ্গই ছিল যথেষ্ট। আমার মতে এমন সিদ্ধান্ত নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা। সংস্কৃতি-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আসলে পশ্চিমী হয়েও দেশবাসীর ভয়ে চরিত্রগোপন করে স্বাদেশিক সেজেছিলেন, একথা বিশ্বাস করাও অসম্ভব। তাঁর পক্ষে এ জাতীয় উভয়চারিতা আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়।

হীরেনবাবু বলেছেন আমি রবীন্দ্রনাথের "জাজ্জ্বল্যমান" "অখণ্ডতা" অস্বীকার করেছি। আমার চেষ্টা ছিল রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতোই তাঁর "রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখা।" বিভিন্ন সময়ে বিরোধী ঝোঁক প্রকাশে অগৌরবের কিছু দেখি না, যদি একটা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখতে কুণ্ঠিত হন নি: "দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই।" পিতার উত্তরাধিকারের আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে যাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, শেষের দিকে তাঁরই মধ্যে secularism-এর চিহ্ন তো অনেকেরই চোখে পড়েছে। তাঁর স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক চিন্তাতেও তো পর্বভেদ লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই "অখণ্ডতা" ছিল, কিন্তু তা আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ই নয়।

হীরেনবাবুর মতে সমাজসংস্কার যুক্তিবাদ মানবিকবাদ—এ সব তো সর্বজনীন ব্যাপার, আমাদের ঐতিহ্যেও রয়েছে, অতএব একে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার সার্থকতা কোথায়। সকল সভ্যতার ইতিহাসেই সব কিছু খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে, আমরা যাকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বলে থাকি ইওরোপেও তার নিদর্শন মেলে। তবে কিনা স্থান-কাল বিশেষে গুরুত্বভেদটা ঐতিহাসিক সত্য।

উনিশ শতকে আমাদের দেশের তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদ পশ্চিম থেকে আসে নি একথা কি অনেকটা গায়ের জোরে তর্ক নয়? ব্রিটিশের দানের কথা ওঠে না, আমাদের নবজাগ্রত মনের আহরণ শক্তি ছিল তার মূলে। সে-জাগরণ আসছিল পশ্চিমী ভাবাদর্শের সংস্পর্শে, যে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সোনার কাঠি প্রথম সেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল।" এসব কথা হীরেনবাবুর অজানা নয়। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমী দৃষ্টি কথাটার ব্যাখ্যা তিনি আমার প্রবন্ধ অনুসারে নয়, নিজের মতো করে করেছেন, সেই জন্য তাঁকে আপত্তি জানাতেই হয়েছে।

সমাজসংস্কারের চেষ্টা আমাদের দেশে আগেও হয়েছে, পণ্ডিতী ন্যায়শাস্ত্রে যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল। মানবিকবাদও একেবারে অজানা বলবার কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও বিশেষজ্ঞ অনেকে বলেন যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'র

মানুষ ঠিক আমাদের সাধারণ অর্থে মানুষ নয়। অতীতের মানবিকবাদ অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ভাসিত, সুতরাং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকবাদ থেকে স্বতন্ত্র। সে যাই হোক মূল প্রশ্ন হল যে উনিশ শতকে আমাদের সংস্কার-যুক্তি-মানবিকতা কি বাস্তব বিচারে দেশের প্রাচীন ধারা ও ঐতিহ্য থেকেই এসেছিল? সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই তো প্রবলভাবে বিরাজ করছিল—অতিপ্রাকৃত জন্মান্তরবাদ, ধর্মের ক্ষেত্রে অধিকারভেদ, মূর্তিপূজা, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা, পণ্ডিতী তর্কের অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও ব্যবহারিক জীবনে কঠোর বিচার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, আমরণ বৈধব্য, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সন্ন্যাসী আদর্শ।

পশ্চিমী দৃষ্টিকে ব্যাহত করবার জন্য প্রাচ্যাভিমানই সেদিন প্রয়াস পেয়েছিল সমগ্র ঐতিহ্যকে খাড়া রাখতে। আর ঐতিহ্য থেকে বিস্মৃতপ্রায় অথচ যুগোপযোগী অঙ্গগুলিকে ছেঁকে তুলবার পিছনে ছিল সংস্কার-যুক্তি-মানবিকবাদেরই প্রেরণা, অর্থাৎ নবাগত বিচারবুদ্ধি। রামমোহন রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন ব্রহ্মবাদ হল শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্য, বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন তাঁরা প্রচলিত ঐতিহ্যধারার অনুধাবন করেন নি, করেছিলেন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ। আর গোটা পশ্চিমী সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করার সংকল্প অন্যদেশীয় চিন্তাশীল মনে উঠতেই পারে না, নিজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে যেটা অনেকখানি স্বাভাবিক। পশ্চিমী সভ্যতার গ্লানির সম্মুখীন হওয়া মাত্র আমাদের মনীষীরা সেই বিচারবুদ্ধি দিয়েই সাব্যস্ত করতেন যে এসব হল পশ্চিমী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, পশ্চিমী মানবিকবাদেরই পরিপন্থী। এর প্রতিধ্বনি 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও লক্ষ্যণীয়। অপর সংস্কৃতি থেকে ভালোটা আহরণের চেষ্টা তো চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে সহজ, অথচ অভিমানবশত স্বদেশী ঐতিহ্যের সবটাকে আঁকড়ে ধরার আবেগ দুর্নিবার। চিন্তার রাজ্যে বার বার এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

নতুন আদর্শ বিদেশ থেকে এল কিনা এটা তো ইতিহাসের প্রশ্ন, এতে লজ্জার কিছু দেখি না। চীন বৌদ্ধধর্মকে ভারতীয় বলে বর্জন করে নি, রোমের জগৎ প্রাচ্য খৃষ্টধর্মকে বরণ করেছিল, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম গৃহীত হল দেশ দেশান্তরে। পশ্চিম ইওরোপের রেনেসাঁসে বিজয়ী গ্রীকদৃষ্টি ঠিক বিদেশী না হলেও অন্য কালাগত—খ্রীষ্টীয় দৃষ্টির প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য তাতে বিদীর্ণই হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় পশ্চিম ইওরোপ থেকে শুরু হল,

আধুনিক উদারনীতির জন্ম ইংরাজ বিপ্লবে, আধুনিক গণতন্ত্রের উৎস ফরাসী বিপ্লব। এইসব কথা মোটামুটি স্বীকৃত বলেই এতদিন আমার ধারণা ছিল।

হীরেনবাবুর শেষ আপত্তি হল সমাজবাদকে "প্রাচ্যাদর্শ নয়, পশ্চিমী দৃষ্টির" সঙ্গে সংযুক্ত করার বিরুদ্ধে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক ইওরোপের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পরিণতি এল সমাজবাদে। এই প্রসঙ্গে লেলিনের The Three Sources and Three Component Parts of Marxism প্রবন্ধটি স্মরণীয়। বলা বাহুল্য আমার উল্লেখিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নের 'অন্তর্বস্তু'টুকু এই মার্কসবাদ। বাস্তব অবস্থা অনুসারে সমাজবাদ নিশ্চয়ই "দুনিয়ার সব দেশেই খাপ খেয়ে যাবার মতো বস্তু", কিন্তু তাতে করে তার পশ্চিম থেকে আগমন কিছু অসিদ্ধ হয়ে যায় না। হীরেনবাবুর বিশ্বাস: "ইওরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না করলেও দেখতাম যে বেদ, উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত।" কী হতে পারত সেটা নিশ্চয় কল্পনার কথা, ইতিহাসের কারবার হল কী হয়েছে তাই নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে দুশন জ্‌ভাভিতেল

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবন নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রগত কারণেই বিড়ম্বিত। যেহেতু সাহিত্য ও সাহিত্যালোচনা জীবন বহির্ভূত নয়, সেহেতু এই বিড়ম্বনার দায় তার উপরেও বর্তেছে। বিশেষত আমাদের সাহিত্যালোচনায় প্রায়শই যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আমাদের মানসক্ষেত্র ইওরোপে হাস্যকর। কেউ কেউ রটান উচ্চমান সম্পন্ন সাহিত্যের অভাব এর মূলে। কিন্তু এই রটনার ভ্রান্তি ধরা পড়ে যখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় অযথা সরলীকরণের ঝোঁক প্রায়ই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সিভিসের বুনিয়ান মডার্ন আইজ নামক প্রবন্ধটি স্মরণীয়। নির্দিষ্ট ছকে ফেলার ফলে ম্যাকলিওসের কাছে বুনিয়ানের ধর্মবোধ শ্রেণী-সংঘাতের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর দিকে সরলীকরণের ফলে টিণ্ডল-এর বিচারে বুনিয়ান সাধারণ জনসাধারণেরই একজন। এই সরলীকরণ সর্বদা পরিত্যাজ্য। নির্দিষ্ট ছকে কোনো বড় লেখককে ফেলা যাঁদের সহজাত, তাঁদের সর্বদাই অবহিত হওয়া উচিত যে উক্ত লেখকের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ হতে পারে, যদিচ কেন্দ্র নিশ্চয়ই একটা থাকে। আসলে, ফ্রন্টইয়ার্স অব ক্রিটিসিজম্ নামক প্রবন্ধে এলিয়ট যে কথা বলেছেন সেকথা প্রতি সমালোচকেরই অবশ্য স্মর্তব্য।—সমালোচক শুধু সমালোচনা কৌশলে পারঙ্গম নন—তাঁকেও সমগ্র ব্যক্তি হতে হবে, বিশেষ নীতি ও বিশ্বাসে বিশিষ্ট হতে হবে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর প্রজ্ঞায় মুক্ত-দৃষ্টি হতে হবে। এখানে আরও একটি কথা স্মরণীয় যে প্রত্যেক সমালোচককেই উপলব্ধি ও উপভোগের উপর সমান জোর দিতে হবে, নচেৎ সাহিত্যালোচনা শুধুমাত্র ব্যাখ্যায় অথবা ইম্প্রেশনিষ্টিক আলোচনায় নিঃশেষিত হবে।

এলিয়ট কথিত সমালোচকের এই বিশিষ্টতা অর্জন করতে গেলে আমাদের মার্কসবাদের দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত উপায় নেই। কারণ মার্কসবাদ কতকগুলি ডগ মা মাত্র নয়। মার্কসবাদের সর্বোচ্চস্তরে সে নিজেই একটি সৃজনাত্মক

প্রজ্ঞা। অতীত সংস্কৃতির বোধগম্যে ও তার সম্পর্কে জ্ঞানার্জনেও মার্কসবাদ সহায়ক। সুতরাং অন্যকে চিরগতিশীল বিশ্ব বোঝাতে বা অনুভব করাতে শিল্পী বা সমালোচক মার্কসবাদকে একটা উন্নততর উপায় হিসাবে পায়। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে মার্কসবাদের মৌল পার্থক্য এইখানেই। কারণ বুর্জোয়া ভাবাদর্শ জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের অসেতুসম্ভব ফারাকের সৃষ্টি করে এবং সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের ধারাকে শুষ্ক করে ফেলে। মার্কসবাদের কাছে সংস্কৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল নয়, এতে সমাজের অবদানও স্বীকার্য। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ নিরূপণে মার্কসবাদ যেহেতু অব্যর্থলক্ষ্য, সেহেতু সংস্কৃতিকে সে দেখে সমাজের সামগ্রিক দ্বন্দ্বময় সংঘাত এবং তার শক্তির প্রকাশ হিসাবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে যৌথ উপায়ে সংস্কৃতি সৃষ্টি দুঃসম্ভব। সেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাতেই ব্যক্তি, কাল ও দেশ রূপ পাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্পীদের কাছে মার্কসবাদের মূল্য কী? এক্ষেত্রে মার্কসবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকেই শিল্পীকে মুক্ত রাখে না, জনসাধারণের প্রাণময় সাংস্কৃতিক জীবন লাভ করার জন্য সংগ্রাম ও বিজয়কেও রক্ষা করে! এ ছাড়া, মার্কসবাদ স্পষ্টতই জানিয়ে দেয় যে অতীত সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকেও বর্তমান জনসাধারণ তাদের মুক্তিসংগ্রামের পাথেয় পায় এবং নতুন সৃষ্টিতে মাতে।

বাংলাদেশের কোনো কোনো মার্কসবাদী রবীন্দ্রালোচনায় কখনো কখনো মারাত্মক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিলেন এ কথা সত্য। এই ভ্রান্তির পেছনে নানা কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল। এছাড়া তখনই এবং পরেও মার্কসবাদী সমালোচকরাই এর প্রতিবাদ করেছেন। বিষ্ণু দের তৎকালীন যুক্তিযুক্ত তীব্র প্রতিবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। সুশোভন সরকার ও গোপাল হালদারের স্থিতধী আলোচনাগুলিও ভুলে গেলে চলবে না। এবং রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে মার্কসবাদের সম্বন্ধ যে অহিনকুল নয় তার প্রমাণও আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধাবলী।* তবুও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের মার্কসীয় রবীন্দ্রচর্চা এখনও অংশত বিড়ম্বিত। বামপন্থীমহলে অধুনা ব্যাপক রবীন্দ্রচর্চা নিঃসন্দেহেই পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই রবীন্দ্রচর্চায়

* Dusan Zbavitel লিখিত Archiv Orientalni পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজীতে লেখা দুটি প্রবন্ধ।

কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রাশিয়ার চিঠি বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী অনন্যসাধারণ লেখাগুলিই কেবল মর্যাদা পায়, তাঁর সুবিপুল মহৎ সাহিত্য উপেক্ষিত হয়। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা তাঁদের স্বকপোলকল্পিত মার্কসবাদে মেশাতে পারেন না তাঁরা তাঁকে এখনও বুর্জোয়া বলেন, আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী তাঁরা তাঁকে প্রায় প্রোলেটারিয়েটের প্রতিভূ করে ছাড়েন। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমই কি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে না। সুতরাং এখনও যখন কোনো কোনো মার্কসীয় সমালোচনায় বিড়ম্বনা দেখা যায়, তখন আমাদের খোঁজ করতে হয় সমাজতান্ত্রিক দেশে রবীন্দ্রালোচনা হয় কিনা, হলে সেখানকার লেখকেরা কিভাবে আলোচনা করেন। এই কারণেই দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর এই প্রবন্ধাবলী আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

যখন এই প্রবন্ধাবলী হাতে এল, তখন মনে মনে একটু সংশয় ছিল। সংশয় দুদিক থেকে। এক, বিদেশী সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঋষি বা মিষ্টিক ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। দুই, সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে এই সমালোচনা এসেছে—আমাদের কোনো কোনো মার্কসীয় সমালোচনার কথা প্রায়ই মনে পড়ছিল। কিন্তু প্রথম প্রবন্ধ পাঠেই বুঝলাম, এর লেখক এই কোনো দলেরই নন। আশ্চর্য লাগল দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর বাংলাদেশ ও ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ বোঝার আগ্রহে। পূর্বে একথা শুনেছিলাম, সমাজতান্ত্রিক দেশে রবীন্দ্রনাথ বহু-আলোচিত ও পরম শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সেই আগ্রহ ও শ্রদ্ধা যে এই স্তরে উঠতে পারে ধারণা ছিল না। বাস্তবিক এমন বিস্তৃত রবীন্দ্র-রচনাবলী পাঠ ও তার মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশেও সুলভ নয়।

এই ছ'টি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দুশন জ্‌ভাভিতেল ১৮৮৭—১৯৪১-এর রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাহিত্য ও চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন। নানা দিগন্ত অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বে কিভাবে এলেন তার ধারা তিনি দেখিয়েছেন। আলোচনার বস্তুনিষ্ঠতায় এই প্রবন্ধগুলি অনন্য—বিশেষত যখন ভাবি এগুলি এসেছে একজন বিদেশীর কাছ থেকে।

প্রবন্ধ ক'টি বিভক্ত হয়েছে এই ভাবে—১৮৮৭—১৮৯১ ; ১৮৯১—১৯০৫ ; ১৯০৫—১৯১৩ ; ১৯১৩—১৯৩০ ; ১৯৩০—১৯৩৭ ; ১৯৩৭—১৯৪১। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্বল্পাকারের সিদ্ধান্ত।

দুশন জ্‌ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেছেন ১৮৮৭ সাল থেকে। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে ১৮৮৫ সালের পরবর্তী রচনাবলীর তুলনা করলে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় 'কড়ি ও কোমল'। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনার কারণানুসন্ধান করেছেন সেই সময়কার জাতীয় জীবনের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কথা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি মূল্যবান ফল, দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর ভাষায় "ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়াদের অধিকাংশের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যাবলীর বৃদ্ধি।" ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ সালে প্রকাশলাভ করল রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও সমালোচনা নামক প্রবন্ধ দুটি। 'কড়ি ও কোমলে' দুশন জ্‌ভাভিতেল সবচেয়ে নতুন যে সদর্থক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন, সেটি হল "রবীন্দ্রনাথের জগৎ সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা।" প্রাথমিক ভাবে এই ধারণা দ্বন্দ্বাত্মক এবং ক্রমবিবর্তনশীল। লেখক আরও জানালেন যে, তিনি এই বৈশিষ্ট্যের উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্যসাধনায় এই ধারণা সর্বক্ষণই সক্রিয় ছিল, কখনোই হারিয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যকে অবশ্য জ্‌ভাভিতেল বুর্জোয়াদের উত্থান-সময়ের প্রগতিশীল চিহ্ন হিসাবেই দেখেন। এবং 'কড়ি ও কোমলে'ই রবীন্দ্রনাথের মানবেতিহাসের প্রগতিশীলতায় গভীর বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পান। যদিচ এই বিশ্বাস ভাববাদে শেষ হয়েছে তথাপি এই বিশ্বাসের জোরেই, জ্‌ভাভিতেল মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক অন্য সব চিন্তানায়কদের থেকে অনেক বেশী মুক্ত দৃষ্টি হয়েছিলেন। 'কড়ি ও কোমল', তিনি আরও জানালেন, তৎকালীন উঠতি বুর্জোয়াদের উৎসাহ ও সম্ভাবনাময় আশার প্রকাশ।

এই প্রবন্ধেই দুশন জ্‌ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেন। বলেন, "যখন আমরা তার নাটককে ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্যের দিক দিক থেকে বিচার করি, তখন আমাদের সিদ্ধান্তকে অনেক পরিমাণে সংকুচিত করতে হবে।" এর কারণ স্বরূপ জানান যে, ভারতীয় নাটকে নাটকীয় টানাপোড়েনের প্রয়োজন হয় না। ঘটনার দীর্ঘ বিবরণেই কাজ চলে। মঞ্চে ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত না হলেও ক্ষতি নেই এবং নাটকীয়

ঘটনা অপেক্ষা ভারতীয় নাটকে ভাব বা আইডিয়ার উপরই জোর দেওয়া হয় বেশি। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালে। এদের জ্‌ভাভিতেল "পাঠ্য নাটক" হিসাবেই দেখেন। 'বিসর্জনে', নাটক হিসাবে নানা ত্রুটি থাকলেও, সংকীর্ণ ধর্মবোধ বা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রতিবাদের মূল্য তিনি স্বীকার করেন। বস্তুত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নিয়ত সংগ্রামকে জ্‌ভাভিতেল বার বার তুলে ধরেছেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হল 'মানসী'। থিম-এর দিক থেকে জ্‌ভাভিতেল মনে করেন 'মানসী' প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই রবীন্দ্রনাথের আগের কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং মোটামুটিভাবে 'কড়ি ও কোমলে'র উন্নতির ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত নয়। 'মানসী'তে স্পষ্টভাবে দেখা গেল, ভারতীয় তথা বাঙ্গালী মেয়েদের দুর্ভাগ্যের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল নববঙ্গ দম্পতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু 'মানসী' সম্পর্কে লেখক শেষ কথা বলেছেন যে যদিচ তিনি 'মানসী'র সদর্থক গুণগুলির উপর বেশি জোর দিয়েছেন, তথাপি 'মানসী'তে ভাবগত ও শিল্পগত স্বল্পমূল্যের কবিতাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। এবং দুর্ভাগ্যত এই কাব্যগ্রন্থে এই ধরনের কবিতাও যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই সময়ের রবীন্দ্রনাথের রচনায় দুটি সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—এক, জীবন ও তার স্বতন্ত্র ঘটনাগুলি (typical facts) সম্পর্কে তাঁর অপর্যাপ্ত জ্ঞান ; দুই, বাস্তব ও দৃঢ় ভাবাদর্শের অভাব। এইখানে এসে প্রথম প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ পাতিসর যাত্রা করেন।

প্রথম প্রবন্ধটির এই বিস্তৃত আলোচনার প্রধান কারণ, দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধেই পাই। শিল্প হিসাবে সাহিত্যের বিচার তিনি করেন নি। মানসীর শিল্পমূল্য সম্পর্কে এর কতকগুলি কবিতার "smaller artistic value-র" উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। পরবর্তী আলোচনাতেও সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে বিশেষ বিচার করেন নি। কচিৎ উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র' সম্পর্কে, 'চৈতালী' প্রসঙ্গে। 'মেঘ ও রৌদ্র' সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে গল্পটির গঠন কৌতূহলোদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ গল্পে সমগ্র মনোযোগ দেন ঘটনাগতির উপর এবং সেটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে

'রৌদ্র ও মেঘের' প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, তৈরি করেছে সমগ্র গল্পের পটভূমিকা, ইঙ্গিত করেছে শশীভূষণ ও গিরিবালার অবস্থা পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের, বিশেষত তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের। চৈতালী প্রসঙ্গে তিনি জানান যে 'চৈতালী'কে সনেট হিসাবে বিচার করলে ভুল করা হবে। কারণ 'চৈতালী'র আঙ্গিকরীতি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। 'চৈতালী'র প্রায় কবিতাই "consist of seven parts, seven ideas or pictures, comprising couplets, each rhyming differently. The whole poem has then, in general, an ascendent tendency up to the final couplet containing the main point."

সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের বিচার না করলেও কয়েকটি মৌলিক কারণে যান্ত্রিক-বস্তুবাদী আলোচনা থেকে (যা আমাদের দেশেও কখনো কখনো দেখা যায়) দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর আলোচনা পৃথক। প্রথমত তিনি রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কী প্রোলেটারিয়েট নিছক তার আলোচনার দায়িত্ব শেষ করেন নি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের পর অসামান্য 'রাশিয়ার চিঠি' বা অসাধারণ কবিতাগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেন নি। রবীন্দ্রকাব্য বা চিন্তাধারার ক্রমানুবর্তনেই যে তারা এসেছে সেকথা জানিয়েছেন। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ধর্মবোধ সম্বন্ধে তিনি সজাগ। এবং চতুর্থত রবীন্দ্রকাব্যে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে তিনি দেখেছেন মানবতা বা হিউম্যানিজমকে।

এবার দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য উক্তির দ্বারা তাঁর বিশিষ্টতা দেখানো যেতে পারে।

জ্‌ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেন। উল্লেখযোগ্য. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লিরিক্যাল—এই বহুপ্রচলিত উক্তিটি তাঁর লেখায় দেখি না। ন্যায্যভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলীর বাস্তবতা, সামাজিক মূল্য বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রগুলি তাঁর কাছে "life-like and realistic in the deepest sense of the word." এই গল্পাবলীতে সামাজিক অত্যাচার, রক্ষণশীলতা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন, স্বাভাবিক কারণেই জ্‌ভাভিতেল সে সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। সোনার তরীও তাঁকে আকর্ষণ করে এর pastoral element-এর জন্য। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন

রবীন্দ্রকবিতায় এই গুণ এই প্রথম দেখা গেল। রবীন্দ্রকাব্যে এই নতুন বৈশিষ্ট্য কবির গ্রামজীবন ও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল। 'চিত্রা'র বহু আলোচিত 'জীবনদেবতা' প্রসঙ্গে তুশন জ্‌ভাভিতেল-এর উক্তি আশ্চর্যভাবে নতুন ও যুক্তিসহ। প্রথমত তিনি মানেন না যে জীবনদেবতা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে এই তত্ত্ব চিত্রারই মাত্র কয়েকটি কবিতায় সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে রবীন্দ্ররচনাবলীর পাঠক ও ছাত্রবৃন্দ এই তত্ত্বকে অযথা অতিমূল্য দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি জীবনদেবতা তত্ত্বের কারণ অনুসন্ধান করেন। তখনকার রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থাই এর মূলে বলে মনে করেন জ্‌ভাভিতেল। এই সময়ে রবীন্দ্রমানসে যে নির্জনতার সাক্ষাৎ আমরা পাই তার কারণস্বরূপ লেখক বলেন—রবীন্দ্রনাথের গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেখানকার জনসাধারণ। অবশ্য জ্‌ভাভিতেল এই সময় রবীন্দ্রনাথের "preoccupation with himself"-কেও জীবনদেবতা তত্ত্ব উদ্ভবের কারণ হিসাবে দেখেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই জীবন-দেবতার ছায়ামুক্ত হলেন এবং তুশন জ্‌ভাভিতেল টমসন সাহেবের সঙ্গে একমত যে এই উৎক্রান্তিই মানুষ এবং কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। জীবনদেবতা-পর্যায় অতিক্রম করার প্রয়াস 'চিত্রা'তেই আছে—উদাহরণস্বরূপ জ্‌ভাভিতেল উল্লেখ করেছেন 'এবার ফিরাও মোরে', 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'র। 'দুই বিঘা জমি' প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল বলেছেন "the first social ballad in Tagore's work and worthy counterpart to the best of his short stories." পরের গ্রন্থ 'চৈতালী'র 'জাতীয়তাবাদী কবিতাগুলি' সম্পর্কে তিনি জানান যে স্বদেশকে মহত্ত্বে দীক্ষা দেবার জন্য স্বদেশবাসীর কাছে স্বাবলম্বনের ডাক দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে 'মানসী' থেকে রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হয়েছেন। উদাহরণ বঙ্গমাতা কবিতাটি। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কল্পনা'য় জ্‌ভাভিতেল সাক্ষাৎ পেলেন "a new anti British note"-এর। এর কারণ তিনি অনুসন্ধান করেন উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেসে যে পরিবর্তনগুলি আসে তার মধ্যে। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত কণ্ঠরোধ নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ ও উদ্ধৃত করেন জ্‌ভাভিতেল। উনিশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে জ্‌ভাভিতেল দেখেন সজীব আশাবাদ,

জীবনের তুচ্ছতম দানেও আনন্দলাভের ক্ষমতা এবং এর ফলে বিশ্বসৌন্দর্য ও সাধারণের কাছে তার প্রকাশ।

এর পর 'ক্ষণিকা'য় সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন। জ্‌ভাভিতেল মনে করেন 'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার গ্রন্থ। 'ক্ষণিকা'র চলতি ভাষার কথাও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তুশন জ্‌ভাভিতেল যে যথার্থ কাব্যরসিক তার পরিচয় 'ক্ষণিকা' সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিতে তিনি দিয়েছেন। কারণ আমরা সাধারণত 'ক্ষণিকা'র অসামান্যতাকে আমল দিই না। বস্তুত জ্‌ভাভিতেল যে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন যথার্থ মার্কসবাদী লেখক তার প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রকাব্যে জাতীয়তাবোধের ক্রমবর্ধমান স্থানলাভের উপর জ্‌ভাভিতেল বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'কল্পনা'র পরবর্তী 'কথা ও কাহিনী'। এই প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল জানিয়েছেন যে এই কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক চেতনাই বেশি সক্রিয়। জাতীয়তাবোধের প্রত্যক্ষ ফল 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি। বিশেষত রাজস্থানী ও মারাঠী কাহিনী সেগুলির অবলম্বন। 'নৈবেদ্যে' ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের।

১৮৯১-১৯০৫ সালের মধ্যে রচিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাওয়া গেল সামাজিক বাস্তবতা, ঘনিষ্ঠ জীবনচেতনা (though following the religious conceptions) এবং জাতীয়তাবোধ।

শ্রীযুক্ত জ্‌ভাভিতেল আবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের, বিষয় ও আকারে, 'religious creation'-এর চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষ্য করেও জ্‌ভাভিতেল বললেন যে বৈষ্ণবজ ভক্তিতত্ত্ব বা মিষ্টিক কবিস্বভাব এই কবিতাগ্রন্থে প্রাধান্য পেলেও রবীন্দ্রনাথের দেশ ও মানুষের প্রতি আগ্রহ এই ঝোঁককে ব্যাহত করেছে। এবং এইজন্যই কবি ঈশ্বরকে এই পৃথিবী এবং তার দুঃখকষ্টের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। তিনি আরও জানালেন যে 'গীতাঞ্জলি'তে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা মোটেই আধ্যাত্মিক নয়। কবিতা গ্রন্থটির ঐক্য নষ্ট না করলেও উপরিউক্ত মানব ও দেশের প্রতি আগ্রহই এখানে স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল 'গীতাঞ্জলি'র একশ ষাট সংখ্যক কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে জ্‌ভাভিতেল-এর উক্তি সঠিক।

'গীতাঞ্জলি'র একষট্টি সংখ্যক কবিতাটিও পূজার কিংবা আধ্যাত্মিক নয়। এই কবিতাটিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই গান হিসাবে প্রেমের পর্যায়ে ফেলেছেন (গীত-বিতান ২য় খণ্ড, প্রেম ২৬৭)। শুধু তাই নয় ভারতের বর্ণভেদ, অধিকাংশ জনসাধারণকে অস্পৃশ্য করার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার শোনা গেছে এই কবিতাগ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত একশ' সাত সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপে এই গ্রন্থের অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার কারণ নির্দেশেও তিনি অব্যর্থ-লক্ষ্য। (যদিও মূল 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতা ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে নেই)। তিনি বলেন যে নিঃসন্দেহভাবেই কবিতা নির্বাচনে (গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমাল্য থেকে) রবীন্দ্রনাথ "সার্থক" হয়েছিলেন। কারণ তৎকালীন আগত যুদ্ধে সশঙ্ক পশ্চিমী বুর্জোয়া সমাজ এই ধর্মভাবসম্পন্ন কবিতায় অবলম্বন পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যত রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বা তাঁর দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় দুর্যোগাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপ সেদিন পায়নি। পূর্বে একজায়গায় বলেছি যে জ্‌ভাভিতেল সাহিত্য শুধু সাহিত্য হিসাবে বিচার করেন না; তাই 'গীতিমাল্যে'র শিল্পগত মূল্যকে স্বীকার করেও, গ্রন্থটিকে উচ্চমূল্য দিতে পারেনি—কারণ এদের বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শ।

'গীতাঞ্জলি' থেকে 'বলাকা'য় উৎক্রান্তির ব্যাখ্যা হিসাবে দুশন জ্‌ভাভিতেল বের্গস" কিংবা গীতিতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান না। সরাসরি জাগিয়েছেন যে সবার উপরে, নিঃসন্দেহভাবে, রবীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠা তাঁকে ফিরিয়ে আনে স্বদেশ ও দেশবাসীর মাঝখানে। সৃজনাত্মক স্বাতন্ত্র্যে, বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আত্মমগ্ন হয়ে থাকার কবিস্বভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না। সুতরাং 'গীতাঞ্জলি, গীতালি', 'গীতিমাল্যে'র আধ্যাত্মিকতা থেকে কবি ফিরে এলেন বাস্তব জগতে, দেশের মাটিতে। ক্রমে প্রকাশিত হল 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪), 'বলাকা' (১৯১৬) এবং 'পলাতকা' (১৯১৮)। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে "a more vigorous and radical" মনোভাব দেখা গেল। এই গল্পগুলিতে সরাসরি হিন্দুসমাজকেই সমালোচনা করা হল। ভারতীয় সাহিত্যে ও সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় critical realisim-এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

এই সময়েই প্রকাশিত হল 'ঘরে বাইরে'। (যখন ভারতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী হয়েছে)। এই উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্যে সন্দেহ প্রকাশ করলেও জ্‌ভাভিতেল এর

ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেন। এ ছাড়া, এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), 'শোধবোধ', 'নটীর পূজা', 'চিরকুমার সভা', 'তপতী', 'পরিত্রাণ' এবং 'রথযাত্রা'। ন্যায্যতই জ্‌বাভিতেল 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ও 'রথযাত্রা'কে (১৯৩২ সালে পরিবর্তিত 'কালের যাত্রা') মূল্য দিয়েছেন বেশি এবং তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী 'কালের যাত্রা'র মূল্য অপরিসীম। 'কালের যাত্রা' "One of the keys to the comprehension of Tagore's conception of the world and politics." আরও বলেছেন 'কালের যাত্রা'য় যে সমাজ ও তার শক্তি এবং শ্রেণীর যে চিত্র পাওয়া যায় সে চিত্র মুমূর্ষ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবচিত্র। আবহাওয়া সৃষ্টিতেও এই নাটক বাস্তবানুগ—পারস্পরিক অবিশ্বাস, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ সবকিছুই সততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

পরবর্তী দুটি প্রবন্ধে অর্থাৎ ১৯৩০ ও ১৯৩৮—'৪১—রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের এই অধ্যায়ের আলোচনায় দুশন জ্‌বাভিতেল আশ্চর্য মনন-শীলতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আবেগদীপ্ত গদ্যে ভারতীয় মহাকবির অতুলনীয় সাহিত্যকৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নতুন দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের তীর্থযাত্রা—তাঁর উপর রাশিয়া ভ্রমণের প্রভাবের আলোচনা করেছেন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণ তাঁর নতুন চিন্তাধারার উৎস হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অবশ্য "did not cause any radical change in Tagore's views nor did they shake his idealistic religio-philosophical conceptions." কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ "underwent clearly a discernable changes after visit to the Soviet union." জ্‌বাভিতেল-এর এই উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত পদ্ধতি এবং ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মৌল পার্থক্য বুঝতে পারলেন। ন্যায্যতই তিনি এই ফলাফলের তুলনা করলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ শাসনকে ঘৃণা করলেন। অন্যদিক থেকেও সোভিয়েত ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্ররচনাবলীর বিশতম খণ্ডে চারশ' তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায়। এছাড়া সোভিয়েত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় সম্পর্কে নতুন আশা, নতুন প্রত্যয় এনেছিল। এই আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রাজনৈতিক কার্যাবলীতে উৎসাহ পেলেন। এবং বৃদ্ধ কবিকে দেখা গেল

হিজলী বন্দীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনুমেণ্টের পাদদেশে বজ্রকণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে কবি এসে দাঁড়ালেন জনসাধারণের কাছে, দেশের মাঝখানে। এ প্রসঙ্গে জ্‌বাভিতেল 'বাঁশি' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। আধুনিক মহৎ শিল্পীর যে পথ হওয়া উচিত সে "রাস্তা মানুষের দিকে"।—আধুনিক মহত্তমশিল্পী রবীন্দ্রনাথও সেই পথেই নেমে এলেন। রাশিয়ার নতুন জীবন দেখে শুধুমাত্র চিন্তায় তীব্র পরিবর্তন এল না, প্রকাশেও দেখা গেল বিপ্লবী প্রচেষ্টা। সত্তর বৎসর বয়সে একান্ত নিজস্ব যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্তিতে কবি গদ্যছন্দের প্রবর্তনা করলেন। লেখা হল 'পুনশ্চ'—সাধারণ মেয়ে এবং একজন লোক এই কাব্যগ্রন্থের চরিত্র। এই সাধারণ নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ তাঁর লেখায় প্রায়ই পাওয়া যেতে লাগল। গুণগত পার্থক্য থাকলেও 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়', 'বাঁশরী' এবং 'চণ্ডালিকা'—'পুনশ্চ' যে প্রেরণায় লেখা হয়েছে সে প্রেরণারই সৃষ্টি।

১৯৩২-৩৩ সালে আন্তর্জাতিক আকাশে ঘনিয়ে এল দুর্যোগের মেঘ। এই সময় থেকে বারবার ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কৃত করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব অকস্মাৎ আসে নি। "It was only the logical culmination of the development of Tagore's political and philosophical conceptions that he, from the very beginning, did not hesitate to oppose fascism whose barbarous inhumanity and use of force was in direct contradiction to Tagore's deep humanism"—দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর এই উক্তি স্মরণীয়।

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হল 'পত্রপুট'। রবীন্দ্রনাথের "ইতিহাস সচেতনতা" প্রকাশ্যভাবে দেখা দিল। এবং আন্তর্জাতিক সমকালীন ঘটনা তাঁর কবিতায় প্রায়ই ছায়া ফেলতে শুরু করল। ১৯৩৭-এ কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিশ্বের দানবদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ক্লান্তিহীন। নাগিনীর নিঃশ্বাসের বায়ুকে ঝড়ে উড়িয়ে দেবার জন্য ডাক পাঠালেন ঘরে ঘরে, 'সেঁজুতি'র জন্মদিন (১ম) কবিতায়। রোগশয্যায় শুয়ে রাশিয়ার দানব প্রতিরোধের অদম্য ও তুলনাহীন প্রচেষ্টায় আনন্দে উদ্ভাসিত হলেন—সভ্যতার সঙ্কটে স্পষ্টভাবেই তাঁর রাশিয়াপ্রীতির কথা জানালেন। এর পাশাপাশি শান্ত সাধারণ বাংলার

গ্রামজীবনের "চল্‌তি ছবি" ধরা পড়ল তাঁর সাহিত্যে। এমন কী যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মধ্যেই মানুষের সব দুর্দশার শেষ বুঝেছিলেন তিনিই আশ্চর্য স্বচ্ছদৃষ্টিতে জানালেন যে তথাকথিত 'কালচার' অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় অস্তিত্বরক্ষার্থে সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের। যার উপর সমাজের, জ্ঞানের উপরিতল বাঁচে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে, যে অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তা অতিক্রমের অদম্য প্রয়াস পান, আশ্চর্য সুন্দরভাবে বলেছেন দুশন জ্‌বাভিতেল। রবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তির অদম্যতায়, মানবতায়, মানুষের পক্ষে, সুন্দরের পক্ষে, প্রকৃতির পক্ষে ক্লান্তিহীন সংগ্রামে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ; বলেছেন, "তাঁর মৃত্যু, নীহাররঞ্জন রায় যেমন বলেছেন, ঐ বৃদ্ধ বয়সেও প্রকৃতপক্ষে অকালমৃত্যু।" কারণ শেষ জীবনের রচনাবলী পরিষ্কারভাবে দেখায় যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবে বৃদ্ধ হন নি। আশ্চর্য আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিতে তিনি শুধু সময় ও তার ক্ষিপ্রস্রোতের সঙ্গে সমান তালে চলেন নি, প্রায়ই বিভিন্ন দিকে "সময়কে ধরে এবং পিছনে" ফেলে গেছেন এবং এতেই, মায়াকভস্কি যা চমৎকারভাবে বলেছেন, "কবির শক্তি নির্ভর করে।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কী নিষ্ঠার সঙ্গে জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করেছেন। জ্‌বাভিতেল-কৃত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর আলোচনা করা হয় নি—এই প্রবন্ধ-আলোচনাতেও তিনি রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। জ্‌বাভিতেল-এর এই অসামান্য প্রবন্ধাবলীর আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার পূর্বে যে সামান্য আপত্তি আছে—সেটা জানিয়ে নিই।

রবীন্দ্রালোচনায় বিষ্ণু দের একটি উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। সেখানে তিনি তাঁর অনবদ্য গদ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জানান, "যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ততন্ত্র সমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব এসব কথা তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয় তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মূলে ছিল, যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষ তত্ত্বমাত্র ছিল না, ছিল জীবনের উদারনীতির

সত্য। তবু তাঁর প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।" এই উক্তি বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় সমালোচককুলেরই অবশ্য স্মর্তব্য। এবং জ্‌বাভিতেলও মাঝে মাঝে এই কথা ভুলে গেছেন। বুর্জোয়া সংকীর্ণ মনকে রবীন্দ্রনাথ কাটিয়ে উঠেছেন একথা স্বীকার করেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধের কারণ স্বরূপ দেখেন "indefiniteness of class bias." সামন্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বুর্জোয়া সমাজের প্রতি আকর্ষণ পরে humanism ও genuine humanity-র জোরে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনকে অতিক্রম—লেখকের মতে এই ত্রিবিধ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধ এসেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যদিও কদাচিৎ, জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্র ব্যাখ্যায় সহজ পন্থা অবলম্বন করেছেন ও কিছুটা যান্ত্রিক। এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক-ছোটোগল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাসের আলোচনা করলেও জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথের গানকে আলোচনায় আনেন নি। অথচ তাঁর গানে এমন বিশিষ্টতা আছে, যা সাহিত্যে বিরল। এখানে স্মরণীয় যে ইওরোপের ইতিহাসের মতো, সামন্ত-বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক যুগ-বিভাগকে ভারতবর্ষে সেভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়—কারণ এদের ইতিহাসে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান।

বাস্তবিক মাঝে মাঝে যে সমাজচিত্রণে নয়, ব্যর্থতার নৈঃসঙ্গ্যে বা যন্ত্রণার মুকুরে দেশ-কাল-সমাজ আরও স্পষ্টভাবে ছায়াপাত করে—এ-কথাটি দুশন জ্‌বাভিতেল আদপে আমলে আনেন নি। মহৎ শিল্পীর বিকাশ যে জটিল পন্থায় ঘটে একথা ভুলে যাবার দরুন ১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রসাহিত্যের দিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় তিনি শুধুই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দেখেন, রবীন্দ্র-মানসের কোনো খবরই রাখেন না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, ব্যক্তির নিজেকে অন্বেষণ—এসবের কোনো স্বতন্ত্র মূল্যই দেন না দুশন জ্‌বাভিতেল। তাই 'একটি আষাঢ়ে গল্প' বা 'তাসের দেশ' যে মর্যাদা পায় তাঁর কাছে, 'নষ্টনীড়' তা পায় না। অথচ 'নষ্টনীড়'-এর অসাধারণত্ব উদাসীন পাঠককেও মুগ্ধ করে। এই ঝোঁকের জন্য জ্‌বাভিতেল-এর এই অনবদ্য লেখা মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনায় আক্রান্ত।

তাঁর এই বিড়ম্বনা প্রকট হয়েছে 'ডাকঘর', 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' সম্পর্কে মন্তব্যে। 'ডাকঘর' সম্পর্কে তিনি লেখেন "the poet certainly also wanted to ridicule the medical "science" which tries to replace proper medical treatment by Sanskrit formulas and anxiously

protects the patient from fresh air and sun and yet, at last, he admits that the representative of the medicine was right—by the death of Amal who was killed by the interference of Thakurdada and the king's doctor." "বৃহত্তর ইতিহাসের নামে কল্পিত ছকে" ফেলতে গিয়ে কী অদ্ভুত উক্তিই না করে বসেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় 'ডাকঘর'-এর মূল বক্তব্য তাঁর বিচারে মর্যাদা পায় নি॥

'চতুরঙ্গ' প্রসঙ্গে বললেন যে এর বিষয়বস্তু যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি সাহসিক। গ্রন্থের প্রথম পর্বে কোনো সন্দেহই নেই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি কত মূল্য দেন মানবতাবাদী এথেইজমের। "But the sudden, also psychologically, rather improbable 'reformation' of sachis in second chapter considerably weakens the plot of the novel". "And so the work does not—and with Tagore cannot end in the victory of atheism over religion, does not put atheism higher than religion." আরও বলেন যে 'চতুরঙ্গ' "is a conflict between practical and active atheism and the two forms of Hinduism—orthodoxy and exalted Vishnuism." কিন্তু 'চতুরঙ্গ'-এর সমস্যা কী এই? শচীশের ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা, তার নিজেকে অন্বেষণ—এ সব-কিছুই মূল্যহীন মনে হল লেখকের কাছে। শ্রীবিলাসের সাধারণত্ব, উপন্যাসের শেষে দামিনীর সাধারণ সংসারেই ফিরে আসার ব্যঞ্জনা—সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হল। নচেৎ 'চতুরঙ্গ' যে পৃথিবীর সাহিত্যেরই একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি একথা তিনি মানতেন।

শেষ পর্যন্ত জ্‌বাভিতেল 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'কে একাকার করলেন এবং মন্তব্য করলেন যে "both of these books are colourfal though not particularly deep, pictures of the life of the well-to-do clasess of Bengali society." 'যোগাযোগ' সম্পর্কে এই উক্তি সকল রবীন্দ্র-পাঠকের কাছেই অগ্রাহ্য মনে হবে। কুমুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মধুসূদনের সংঘাত, একটি জীবনের প্যাটার্নের সঙ্গে অন্য একটি প্যাটার্নের দ্বন্দ্ব, ভালোবাসতে চাইলেও যে ভালোবাসা যায় না তার আশ্চর্য চিত্র—সবই দুশন জ্‌বাভিতেল-এর চোখ এড়াল। এমন কী মধুসূদনের মধ্যে উঠতি অথচ পঙ্গু

বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর চিত্রও যে কী করে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল—বোঝা যায় না।

'গোরা' সম্পর্কেও মামুলী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন "we have already mentioned the excessive space devoted to theoritical discussions which hold up the action. The worst fault in the conception of the novel is that Gora is liberated from the grip of orthodoxy without his own effort..." আশ্চর্য যে গোরার অস্থিরতা, তার যন্ত্রণা, তার জীবনের পরিহাস কিছুই লেখকের দৃষ্টিগোচর হল না। সর্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার মানবধর্মে উত্তরণ—সবই তাঁর চোখ এড়ান। বুঝলেন না, "গোরা, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু'ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে।"

নাটকের আলোচনাতেও, কদাচিৎ যদিও, একই বিড়ম্বনা। অবশ্যই 'কালের যাত্রা'র গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কিন্তু নাট্যগত উৎকর্ষের আলোচনা ব্যতিরেকে 'কালের যাত্রা'কে শুধু ভাবাদর্শের, ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব চিত্রণের (এটি যদিও মূল্যবান) কারণে 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা'র উপরে স্থান দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত ? 'পূরবী'র বৈশিষ্ট্য উপেক্ষায়ও একই নীতি কাজ করেছে।

বস্তুত শুদ্ধ সাহিত্যালোচনা যদিও সম্ভব নয়, তবু শুধু ভাবাদর্শের ব্যাখ্যায়, শুধু সমাজ বিশ্লেষণে—সাহিত্যকে বিচার করলে এই ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের বিচার সাহিত্য হিসাবে—নচেৎ নিছক শুদ্ধতম জীবনদর্শন সম্বল করেও সাহিত্যে স্থায়ীকীর্তি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "শিল্প সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল"—সেখানে কোনো প্রকার সরলীকরণই বিড়ম্বনাময়।

কিন্তু এহ বাহ্য। কারণ এই সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দুশন জ্‌বাভিতেল-এর আলোচনার মূল্য অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও চিন্তার, স্বদেশ অভিব্যক্তির, কবির নিজ সীমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও তা অতিক্রমণের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় দুশন জ্‌বাভিতেল শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনই নন, শ্রদ্ধাভাজনও বটে। এছাড়া, এমন বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সাধারণ মূল্য

অপরিসীম। অনন্যসাধারণ স্বচ্ছদৃষ্টিতে জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন—সারাজীবনের বিরোধ কাটিয়ে শেষ জীবনে আশ্চর্য সমন্বয়-সাধনে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে ওঠার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপর এমন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বের যথার্থ কারণ নির্দেশ আমাদের দেশেও দুর্লভ। সবশেষে, বর্তমান প্রবন্ধকার চমৎকৃত হয়েছেন দুশন জ্‌বাভিতেল-এর রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠের গভীরতায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহে।

"Tagore became (দুশন জ্‌ভাভিতেল বলেন) the truly national poet of Bengal; when his best works have been made accessible to the world in good translations—which has so far happened only in few cases—a desirable and much needed revision of the distorted 'western' conception of the great personality of world culture will follow. And towards the goal especially, this present work wishes to make a modest contribution."

এরপর দুশন জ্‌বাভিতেলকে জানাতে হয় অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সমাজতান্ত্রিক দেশের এই মানুষটি বাঙালীকে শুধু তাঁর কাছেই ঋণী করলেন না, বাঁধলেন তাঁর দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে।

আশা করি, দুশন জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথের উপর আরও লিখবেন—ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়, তাঁর নিজের ভাষা চেক-এ।

পুস্তক পরিচয়

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা। ছয় টাকা ॥

এ তথ্য স্বীকার্য বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস নিয়ে আলোচনা যত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে তাঁর মননশীলতার দিকটি তেমনভাবে আলোচিত হয় নি। বঙ্কিম শুধু artist ছিলেন না, thinkerও ছিলেন একথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণারও শেষ নেই সেজন্য। রক্ষণশীল, সনাতনী, প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রভৃতি বিশেষণও বঙ্কিমের নামের সঙ্গে অনেকে সংযুক্ত করে থাকেন। বলা বাহুল্য তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের পটভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন নি এবং ঐ শতকের অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীদের রচনার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে বঙ্কিমের যথার্থ মূল্য নিরূপণে অগ্রসর হন নি। অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার, রমেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতার প্রসঙ্গ নিয়ে ভালো আলোচনা করেছেন। শ্রীভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' এই ধারার বই এবং সেজন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

বইখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মননসাধনার অনুবর্তী হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার পর্যালোচনা পরিশিষ্টরূপে গ্রথিত হয়েছে। লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে রামমোহন ও 'ইয়ংবেঙ্গল'দের যুগে, যে-মননচর্চা ও সমাজচিন্তা লক্ষিত হয় ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও মননধর্মে তারই সুপরিণত প্রতিষ্ঠা। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রামমোহন, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির চিন্তায় ও রচনায় মননচর্চা, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানসেবা, পুরাতত্ত্বানুশীলন যে-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে নবজাগরণের তথা যুক্তিধর্মিতার যুগ বলে আখ্যাত

করা অনৈতিহাসিক নয়। পরলোকের চেয়ে ইহলোক, আধ্যাত্মিক-পন্থার চেয়ে বুদ্ধি ও যুক্তিপন্থা, তথাকথিত পুণ্যার্জনের চেয়ে মস্তিষ্ক, পেশী ও হৃদয়-বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধন, দেবস্তুতি অপেক্ষা নরকল্যাণ—এর সবই রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় নানাভাবে দেখা দিয়েছে। 'বঙ্কিমযুগের মননসাধনা' অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গগুলো আলোচিত হয়েছে। লেখক পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ শশধর-কৃষ্ণপ্রসন্ন-রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের শ্রেণীভুক্ত নন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরানুগত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস থেকে মুক্ত।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-নায়কদের কথা মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থের নাম-পত্রে আচার্য সীলির উক্তি উৎকলিত হয়েছে। সীলি (১৮৩৪—১৮৯৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমজীবী। তাঁর Ecce Homo (১৮৬৩) বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল, সীলি-র Natural Religionও (১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্রের অনধীত ছিল না। সীলি খ্রীষ্টকে 'মানব' হিসাবেই দেখেছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। সীলি ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনিও তার Natural Religionকে সকল অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে দেখেছেন। সীলি 'কালচার'কে (বঙ্কিমের ভাষায় 'অনুশীলন') ধর্মের ফলস্বরূপ বলে মনে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনেকটা সে-পথে গিয়ে গীতার কর্মযোগকে মুখ্যত গ্রহণ করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের শিক্ষাদান-নীতি তার নিদর্শন। শুধু সীলির রচনা নয়, কোম্‌তে, হিউম্, বেন্থাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সর প্রভৃতির রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কোম্‌তের মত একদা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। ইংলণ্ডে positivist গোষ্ঠী যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জর্জ হেনরি লিউয়েস, জর্জ এলিয়ট, হ্যারিয়েট মার্টিন্যু এবং রিচার্ড কনগ্রিভের নাম উল্লেখযোগ্য। কোম্‌তের মতবাদই ইংলণ্ডে ১৮৩৭ থেকে প্রচারিত হতে থাকে। তাঁর 'Cours de Philosophic positive' ১৮৪২-এ সমাপ্ত হয়। ক্যাথলিক-পন্থী ঈশ্বরতত্ত্বের পরিবর্তে কোম্‌তে মানবতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশেও উনবিংশ শতকে অনেকে পজিটিভিষ্ট ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। মিলের সঙ্গে কোমতের মতৈক্য, পরে মতানৈক্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে সমষ্টিবাদ ও ব্যষ্টিবাদের সামঞ্জস্যসাধন প্রচেষ্টা,

লেখক যথোপযুক্ত তথ্য দ্বারা বিবৃত করেছেন তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের অনিবার্য পরিণতি লার্মার্ক, ডারউইন, স্পেনসার, ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির রচনায়। হর্বার্ট স্পেনসার অভিব্যক্তিবাদ বা evolution-কে মনে করতেন "the law of the continuous redistribution of matter and motion"। তিনি পূর্বেই লার্মার্কের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ডারউইনের 'origin of species' (১৮৫৯) প্রকাশিত হবার পর তাঁর মতামত আরও সুস্পষ্ট হয়। স্পেনসারের Synthetic Philosophy পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবহারবিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রেই তিনি অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। তিনিও 'সামঞ্জস্যবাদ'-এর পক্ষপাতী। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে স্পেনসার-পন্থার বিরোধ নেই। কোম্‌তের রচনাতেই তিনি অবশ্য প্রথম তাঁর 'অনুশীলন' তত্ত্বের সূত্র পান। পরে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্যমনীষীর রচনা ও ভগবদ্‌গীতার দ্বারা তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট 'জীবনাদর্শ' রূপে গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে ঈশ্বর, পরলোক, আধ্যাত্মিক মার্গের সংযোগ নেই। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইংলণ্ডে 'স্কটিশস্কুল'-এর প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে 'ইউটিলিটারিয়ান'দের প্রতিষ্ঠা ঘটে। জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) এই মতাদর্শের প্রবক্তা এবং তারপর জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) তাঁর ধারাকে চালিয়ে নিয়ে যান। বেন্থাম যদিচ উনবিংশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু তাঁর চিন্তা ও ধারণায় তিনি অষ্টাদশ শতকের Age of Reason-এর মানুষ। রামমোহন রায় বেন্থামের কল্যাণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থামের মতাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে স্বাভাবিক কারণেই লেখক ইংলণ্ডে উনবিংশ শতকে ধর্মকে নবরূপে গড়বার প্রচেষ্টাগুলির উল্লেখ করেছেন। কার্ডিনাল নিউম্যানের 'Oxford Movement' এই প্রচেষ্টারই ফল। কার্ডিনাল নিউম্যান (১৮০১-৯০)-এর অক্সফোর্ড মুভমেণ্ট ১৮৩৩ থেকে শুরু হয়। তাঁর আন্দোলন, অষ্টাদশ শতকের 'র‍্যাশনালিজম' অর্থাৎ নির্মোহ যুক্তি ও বুদ্ধিগত বিচারপ্রবণতার বিরুদ্ধে। সমালোচক লিখেছেন "but he used reason to maintain beliefs"। বঙ্কিমচন্দ্র আবেগপ্রবণ-ভক্তিবাদকে স্বীকার করেননি, কেশবচন্দ্র সেনের চিন্তার মহিমা স্বীকার করলেও তাঁর সংকীর্তন, প্রত্যাদেশ, নরপূজা প্রভৃতিকে পরিহার করেছেন। অষ্টাদশ শতকীয় মন যেমনভাবে নিউম্যানের "ক্যাথলিক

প্রতিক্রিয়া"কে (Catholic Reaction) স্বীকার করতেই পারে না তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ঐ জাতীয় আবেগাত্মক ধর্মমতে সমর্থন বা আস্থা স্থাপন কোনোটিই সম্ভব ছিল না। লেখক বঙ্কিমমানসের এই দিকটি পূর্বোক্ত অধ্যায় দুটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত রমেশচন্দ্র বসুর আলোচনাগুলি এই সূত্রে মনে পড়ে।

পরের প্রবন্ধটি 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারত সংস্কৃতি'। ভারত-সংস্কৃতি চর্চা নবজাগরণের অন্যতম উজ্জ্বল লক্ষণ এবং সেই চর্চার সূত্রপাতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দান অগ্রগণ্য। কিন্তু নবজাগরণের আলোকপায়ী জাতি সর্বদেশেই স্বদেশের শাস্ত্র ও পুরাবৃত্তের নবব্যাখ্যা ও আবিষ্কারে উৎসাহী হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম হয়নি। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বিদ্যাসাগর সকলেই এ-বিষয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের ঐতিহ্যকে বরণ করে নিয়ে, তাঁদের চিন্তার অংশভাক্‌ হয়ে ভারতীয় ইতিহাস, জনতত্ত্ব, সাহিত্য—সর্ববিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতকে একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। নবীনচন্দ্রকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতে ভারতীয় ইতিহাসের যে খসড়া পরিকল্পনার সন্ধান মেলে, তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আধুনিক' ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয়বহরূপে স্বীকার করতে হবে। শুধু ইতিহাস রচনা নয় ভারতীয় সংস্কৃতির নবব্যাখ্যা, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীপ্ত মানবপন্থী ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারই নিদর্শন। সেজন্য বুদ্ধদেবকে তিনি আদর্শ মানব হিসাবে না দেখে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে ঘোষণা করেছিলেন। কেননা বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী। কিন্তু সংসারে থেকে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সামঞ্জস্যসাধনে পূর্ণ মানবতার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ।

'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধদুটি সুলিখিত। পরিশিষ্টের প্রবন্ধদ্বয় বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনাও তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিসিদ্ধ। বাংলার রেনেসাঁস বা নবযুগের বাংলা সম্পর্কিত রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমন্বিত বোধের দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই দৃষ্টি ছিল। তবে বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যে বাঙালী chauvinism বহু ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল এবং ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে তিনি গ্রথিত করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যে উনবিংশ শতকে অনুরূপ ঘটনা দেখা গেছে। কাজেই বিপিনচন্দ্র সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি ও বিচারবোধের

দ্বারা চালিত হয়েছিলেন একথা স্বীকার করা দুরূহ। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নবজাগরণ-চেতনাও revivalism থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' (১৮৬৪-১৯১৯) উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগের বহুমুখী চিন্তাধারাকে নিজের মধ্যে সংহত করতে পেরেছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় কি করে ঘটানো যায় তিনি সেকথা পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর কোনও বিষয়ে খুব নতুন কথা বলেছেন বলা যায় না। তবে বোধ করি তিনিই প্রথম ডারউইন, বিশেষত হার্বার্ট স্পেনসারের synthetic philosophyর পন্থায় সৌন্দর্যতত্ত্ব, সুখদুঃখতত্ত্ব—সর্বক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদ প্রয়োগের প্রয়াস পান। 'কর্মকথা'র প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থাকেই অনুসরণ করেছেন। লেখক রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন রচনা থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শ্রীভবতোষ দত্ত ভাবাবেগ, পূর্ব-সংস্কার বা অন্ধমোহ নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচনা করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের তথা তাঁর অনুবর্তীদের মননশীল দৃষ্টি ও সামাজিক চেতনা সম্পর্কে প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন। এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই উনবিংশ শতকের বাঙালীর মনঃপ্রকর্ষের বিভিন্ন দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কাজেই বইখানি শুধু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি বহন করছে না, গোটা উনবিংশ শতকের চিন্তাজগতের সমালোচনাই এখানে করা হয়েছে। সেদিক থেকে বইখানির অতিরিক্ত মূল্য রয়েছে। শিক্ষিত সমাজ এই বইখানি পড়বেন এই আশা নিয়ে আলোচনাটি শেষ করা হল।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

একসূত্রে গাঁথা : ভারতীয় বারোটি ভাষার গল্প ॥ অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্। গ্রন্থবিহার। তিন টাকা ॥

বর্তমানে যখন ভারতের ঐক্য নানা কারণে বিপর্যস্ত, বিশেষ করে ভাষার প্রশ্নে আমাদের মনে যখন উষ্মা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তখন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মুখ্য ভাষাগুলির সাহিত্যিক নিদর্শন যদি একই প্রচ্ছদে গ্রথিত হয়, তবে সে-প্রচেষ্টার সৎ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিমত

হওয়া অসম্ভব। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ বারোটি ভাষার ছোটগল্পের অনুবাদ একসূত্রে গেঁথে বাঙালী পাঠক সমাজে পরিবেশন করেছেন, এজন্য তিনি অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথম্ যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন, তার সবগুলির মান সমান উন্নত বলে মনে হয় না। অনুবাদক আটটি ভারতীয় ভাষা জানেন, অতএব তাঁর কাছে আরও অনুসন্ধান ও পরিশ্রম দাবি করি। অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যিক অগ্রগতির স্বাক্ষর বিদ্যমান, একথা প্রমাণ করাই বোধহয় অনুবাদকের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এই দুর্লভ ভাষাজ্ঞান ও ভারতবর্ষীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগের পরিচয় দিয়েছেন। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এবং অন্য গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির শ্রেষ্ঠ ফসলের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। অবশ্যই বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসাধারণকে সে কাজে অনেকখানি সাহায্য করবে।

ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা ॥ চিত্ত ভট্টাচার্য। ফ্রেণ্ডস বুক ক্লাব। আড়াই টাকা ॥

'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা' বোধহয় চিত্ত ভট্টাচার্য-র প্রথম গল্প সংকলন। মাত্র দশটি গল্প একত্রিত করে একটি ছোট্ট ভূমিকা সহযোগে লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা', 'অতনুবোসের কাহিনী', 'স্মৃতি গন্ধা' গল্পগুলিতে মিষ্টি হাতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই গল্পগুলি তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে। কিন্তু অবশিষ্ট গল্পগুলি খানিকটা গতানুগতিক এবং অনেক সময় দ্রুত লেখার জন্যেই হয়তো কয়েকটি গল্প নক্শার স্তর পেরোতে পারে নি। গল্প শুধু গল্পের জন্য লেখা হয় না, সেই গল্পে জীবনের তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যিক-কর্তব্য। অত্যন্ত আশার কথা প্রথম গ্রন্থেই লেখক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা সাগ্রহে পাঠ করব।

যান্ত্রিক ॥ অঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। দু টাকা ॥

'যান্ত্রিক' লেখকের প্রথম পুস্তক। কিন্তু গ্রন্থটি রম্যরচনা, গল্প, না রিপোর্টাজ? প্রশ্নটির সমাধান দুরূহ। অতএব 'যান্ত্রিক' একটি গ্রন্থ—এই নামে অভিহিত

করাই ভালো। লেখক লেখাগুলি বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন, তার মধ্যে কিছু হারিয়েছে, কিছু বা তিনি স্বেচ্ছায় ছিঁড়ে ফেলেছেন। বস্তুত লিখলেই যে ছাপতে হবে এবং ছাপলেই যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু ভূমিকায় প্রকাশ অঞ্জনবাবু অনেক চিন্তা করে লেখাগুলি প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিন্তার প্রতি সর্বত্র সায় না থাকলেও আমরা তাঁর উদ্যমের প্রশংসা করি।

কার্তিক লাহিড়ী

ভারততীর্থ (প্রথম তরঙ্গ) ॥ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিচিত্রা। দু টাকা।

"আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকপুঙ্গব সংখ্যায় এগারো। আমাদের উদ্দেশ্য মাদ্রাজে অনুষ্ঠেয় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান এবং তৎসহ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক ঢিলে দুই পাখি।" শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় এবং অভিপ্রায় তাঁর 'ভারততীর্থ' গ্রন্থের সূচনাতেই এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবে উক্তিটির শেষাংশ সামান্য সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য দুটির বদলে তিনটি পাখি মেরেছেন: শেষ পাখিটি হচ্ছে—একটি বই লেখা। অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনী রচনা। এখন বিচার্য, ভ্রমণকাহিনীর পাখিটি কেমন।

ভ্রমণকাহিনীর মানে কি? ভ্রমণের কাহিনী, না ভ্রমণকেই কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষক করে তোলা? প্রথমটি সহজসাধ্য, শেষেরটি দক্ষ কলমের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লান্তিকর অর্থাৎ পাঠযোগ্য নয় অর্থাৎ কতগুলি ভূগোল আর ইতিহাসের বাসি তথ্যের সমাহার, যা লেখা নিতান্তই পণ্ডশ্রম, কেননা এই ধরণের তথ্য অনেকেরই জানা এবং বিশেষ করে, এর জন্যে সরকারী টুরিজিম্ বিভাগ তৈরি হয়েছে। অপিচ, এই ধরণের লেখায় প্রায়ই নানান ছবি থাকে: ঘোড়ায় চড়া লেখকের ছবি, পাহাড়, মন্দির-জলপ্রপাত এবং উপজাতি-সুন্দরী মেয়ে, লোকনৃত্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি সুখপাঠ্য, তথ্য ভারাক্রান্ত না হয়ে লেখকের সরস দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবেদনায় রচনাটি অভিষিক্ত এবং তাই সাহিত্যের স্তরে উন্নয়নযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য সম্ভবত, 'ভ্রমণকাহিনী'র চরিত্র সম্বন্ধে সংশয়ী; তাই তাঁর 'ভারততীর্থ'তে সদ্যোকথিত দুটি ধারারই, সমন্বয় নয়, সমান্তরাল প্রকাশ ঘটেছে। সমস্ত

হলে অবশ্য ভালোই হত: তথ্যগুলো সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় নি; সুন্দর বর্ণনা পড়ে চলেছি, বেশ দু এক আঁচড়ে চরিত্র তৈরি করার ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছি লেখকের, এমন সময় অতর্কিতে "ফরফর করে উড়ে গেল ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা!" ইতিহাস শুধু নয়, লোক-কাহিনীরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণাংশে। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা এই অংশে বিবৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যেখানেই লেখকের কলম চরিত্রচিত্রণ আর ব্যক্তিগত সরস অভিজ্ঞতার রূপায়ণে মুখর হয়েছে, সেখানেই আমরা আকৃষ্ট হতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেরালা পর্বটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশটির নাম 'পঞ্চনদের তীরে।' তুলনায় এই অংশটিই সুলিখিত অর্থাৎ ইতিহাস-ভূগোলের অত্যাচার থেকে লেখক আমাদের রেহাই দিয়ে কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ সরসতায় প্রচ্ছন্ন কয়েকটি পৃষ্ঠা উপহার দিয়েছেন। সেখানে মানুষই তাঁর বিষয়, তার আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ভ্রমণ-কাহিনীও কথা সাহিত্যের মতো সেখানেই শিল্পায়িত হয় যেখানে তার উপজীব্য দেশকালবিধৃত মানুষ। দেশ-কালকে তুচ্ছ করার প্রশ্নই উঠছে না, কিন্তু মানুষের কথা বিস্মৃত হলে রচনা সাহিত্যিক কৌলীন্য অর্জন করতে পারে না। সুতরাং ইতিহাস-ভূগোলের ভূমিকা ঠিক ততখানিই স্বীকার্য ততখানি তারা মানুষকে গড়ে তোলার পক্ষে সহকারী। পাঞ্জাব-ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে লেখক জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এই উক্তিটিকেই মেনে নিয়েছেন মনে হয়। লেখকের ভাষার সাবলীলতা কিছু কিছু অংশে কাঁচা করিয়ে ব্যাহত হলেও প্রশংসার্হ। এবং এইজন্যেই বইখানি শেষ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। 'ভারততীর্থ'-র দ্বিতীয় তরঙ্গে কি কি থাকবে জানতে ইচ্ছা করি।

শিবশম্ভু পাল

সাম্প্রতিক সাহিত্য

ডকশ্রমিকদের জীবন-গাথা

বার্ণিক রায়

সান মার্টিন শহরে সমুদ্রের উপকূলে জয়েস নামে একটি নিগ্রো মেয়ে এল ওয়েল্ডারের কাজ শিখতে। এই মেয়েটির জীবনকে কেন্দ্র করে আলেকসান্দ্র [illegible] স্যাক্সটন আমেরিকার ডক অঞ্চলের শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার একটি রসঘন বর্ণাঢ্য চিত্ররচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস Bright web in the Darkness-এ।*

জয়েস দিনে কাজ করে, রাত্রে ক্লাশ করে। ভবিষ্যতে আশা আছে যে [illegible] স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। এখানে নিগ্রোর কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকানদের শ্বেতবর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। আমেরিকান দুহিতা স্যালির নিজের স্বাধীন জীবিকা বেছে নিতে রাত্রির এই ক্লাশে যোগদান করেছে, হোটেলের ওয়েট্রেসের চাকরির চেয়ে নিজে খেটে খাওয়া অনেক ভাল। জয়েস থাকে তারই পরিচিত হেণ্ডারসনের বাড়িতে। একা রাত্রিতে ঘুমের আগে, সকালে ঘুম ভাঙার পর চিন্তা করে মায়ের কথা, তার বাবার কথা। মনে পড়ে তার ফেলে আসা নেভেদার সিগন্যাল স্প্রিংগসের গ্রামের কথা। এমনি ভাবে দিন এগিয়ে যায়। কাজ শিখে অনিশ্চয়তার মধ্যে চাকরিতে যোগদান করে [illegible] কাজ করতে করতেই স্যালির সঙ্গে টমের প্রেম ও পরিণয় হয়, জয়েসের সঙ্গে সমুদ্র নাবিক চিত্রশিল্পী চার্লির পরিচয়ে দুয়ের হৃদয়বৃন্তে প্রেমের রক্ত-গোলাপ উঁকি মেরে যায়। চার্লির বিবাহে সম্মতি থাকা সত্ত্বেও অপরিচিতের [illegible] হঠাৎ নিজের করে নিতে পারে না। তার যন্ত্রসংগীত পিয়ানোর সুরে [illegible] অঙ্গে বিহ্বল সুর জাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যে সমুদ্র নাবিক সমুদ্রের [illegible] দূরত্বের অভিযানের মধ্যে নিজের মনপ্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছে, [illegible] মধ্যে কোথায় যেন একটা ভয়, একটা আশঙ্কা জড়িয়ে থাকে। [illegible]

* Bright web in the Darkness. Alexander Saxton. Seven S[illegible] Distributors : National Book Agency (Private) Ltd. Calcutta-12. R[illegible]

শিল্পী। সে অসুস্থ, হসপিটাল থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। এই তো সামান্য পরিচয়।

নীচেরতলার মানুষের মধ্যে মানুষের জাতিভেদ বর্ণভেদ নেই বটে, কেন না তারা একই অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু উপরিতলার মানুষের মধ্যে ভেদ আছে। শুধু নীচেরতলার মানুষের আর্থিক শোষণই শেষ কথা নয়। আমেরিকার দুরপেনয় শ্বেত ও কৃষ্ণের বৈষম্যের মধ্যে ভেদ জাগিয়ে তাদের শোষণনীতিকে জাগ্রত করে তুলছে। বলতে গেলে তাদের য়ুনিয়ন নেই। একটা সামান্য (auxiliary) আছে। তাতেও তাদের সভা ডাকার কোনো অধিকার নেই। ওয়েল্ডারের শিল্প ও কর্মনিপুণতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ কাজ তারা পায় না। বাইরে কোনো বিভেদ নেই, অন্তরমূলে এই বিভেদের বিষবীজ চতুর্দিকে বিষাক্ত মহীরুহ সৃষ্টি করে তুলছে। যে কয়েকটি নিগ্রো শ্রমিক আছে, তারা তাদের কৃষ্ণবর্ণত্বের অভিশাপে এই জ্বালা সর্বক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। এই নির্বাক নিস্তব্ধ অন্তর্জালার মধ্যে তারা অন্য সকলের থেকে পৃথক হয়ে আছে। এই শোষণ ও শাসনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মালিকেরা, তাদের আমোদবিলাস নারী মদ নিয়ে, তাদের নারীরা মগ্ন হয়ে আছে হলিউডের নৃত্যের উন্মাদনায়। মালিক স্টোনের পত্নী সিল্‌ভিয়ার সমগ্র জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে হলিউডের নৃত্যে যোগদান করতে পারেনি বলে। অবসরে জুয়োখেলাই হল মালিকদের একমাত্র নেশা ও অবসরবিনোদন। সমাজের সঙ্গেই এটা অঙ্গীভূত। স্টোনের অংশীদারেরাও তাদের স্বার্থের জন্যে স্টোনের পুত্রকে ব্যবহার করতে চাইছে আসন্ন নির্বাচনে। এদের গর্ব হল এরা শিক্ষা পায়নি, কিন্তু শিক্ষিতদের অনায়াসে তাদের তাঁবে আনতে পারে। মাঝে মাঝে তারা যে অভিসন্ধির জাল রচনা করে, তাতে শ্রমিকদের কেউ কেউ ধরা পড়ে। শ্রমিক য়ুনিয়নে যোগদান করে যাতে নিগ্রোরা উন্নতির কোনো পথ না করতে পারে, তার জন্যে লোভ দেখায়। স্যালির প্রণয়ী টম্ নিগ্রোদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণ। বাণিজ্য জাহাজের কর্মচারী টমের জাহাজ যেদিন টর্পীডোতে আয়ার্ল্যাণ্ডের কূলে ধ্বংস হয়ে গেল, নানাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদেশী লোকদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সে সময় সে সংবাদ পেল একটি নিগ্রো মেয়ে স্যালির ঘরে একত্র থাকে, এতে তার মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। নানাদেশ ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, স্পেন ভাষা সম্বন্ধে সামান্য

জ্ঞান নিয়ে যখন ফিরে এল তখন ডকে জাহাজ তৈরির কারখানায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা দেখা দিয়েছে, তারা সমান অধিকার চায়, তাদের দলভুক্ত করে নেবার জন্যে সংগ্রাম করতে চায়। স্যালি আগামী য়ুনিয়নের সভায় এই ঐকতার জন্যে ভাষণ তৈরি করছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ এক অধিকার পাবে। স্যালির এই চেতনায় টম অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং যখন স্টোন তাকে প্রলোভন দেখিয়ে টমের ল পড়ার ইচ্ছাকে উস্‌কে দিয়েছে, তখন স্যালির এই মনোভাবের বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ করেছে। কি দরকার এসব করবার নিজের উন্নতিকে আত্মবলি দিয়ে। তাই স্ত্রীকে ত্যাগ করে রাত্রেই চলে গেছে সে।

দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনে জয়েসের মনে নানাভাবের আলোড়ন ঘটে যায়। চার্লির কথা মনে করে তার যৌবন হৃদয়ে ব্যাকুল সুরভি ছড়াতে থাকে। মাঝে মাঝে মনে ব্যথা ও অনুতাপ জাগে, চার্লির সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিলেই ভালো হত। টম ও স্যালির দাম্পত্যজীবন দেখে, স্যালির উন্নত যৌবনের বুকে প্রেমের পরিণত রূপ দেখে, জয়েসের মনে আসঙ্গলিপ্সা, ঘর বাঁধবার দুর্বার পরিকল্পনা ব্যথা জাগাতে থাকে। সাদা দেহের ওপরে লাল দাগগুলি স্যালির মনে পূর্ণরূপ দেখে মনের কোণে এক দুর্বার ঈর্ষা জাগাতে থাকে। সমুদ্র উপকূলের প্রকৃতির মধ্যে, চারিদিকের নির্জন নিসর্গের মধ্যে জয়েস তার নির্জন মনের সঙ্গী খোঁজে। এই সময়েই খবর এল চার্লি হাসপাতালে মারা যাচ্ছে। এমনি করেই তার প্রেমের বৃন্ত ঝরে গেল।

নিগ্রো শ্রমিকেরা অধিকার চায়, কিন্তু মালিক বা শ্বেতাঙ্গরা তা দিতে চায় না। তাদের এই অধিকারের দাবি স্থানীয় কোর্টে উঠল, কিন্তু কোর্ট রায় দিল মালিকদের পক্ষে। বিজয়ীপক্ষ যে প্রকারেই হোক বিজিতদের দমন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল। প্রেমিকের মৃত্যুতে, হঠাৎ মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে জয়েসের মনে ঔদাসীন্য হয়তো এসেছিল কিছু কাজে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রায় এল এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যে তার চাকরি যাবে। পনেরো দিন দেখা হবে সে ভালোভাবে কাজ করে কিনা, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বার্থপর অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরা তাদের পরাজয়ে অকথ্য ব্যবহার আরম্ভ করে।

এমনি হতাশার মধ্যেই দিন যায়। কিন্তু পূজ্যপাদ বীজিলি তাদের অধিকারের দাবি সুপ্রীম কোর্টে উপস্থাপিত করে, Negro Improvement

League এখানেই জয়লাভ করে। অন্ধকার হতাশ্বাসের বুকে আশার উষা আলোকিত হয়ে উঠল। প্রেমিকের মৃত্যুর বিষণ্ণতা, জাতীয়তার আশান্বিত বিজয়ের আনন্দ, তার পিয়ানোতে অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করল। এই বিজয়সভার আহ্বানে তার পিয়ানো এমিলি ডিকিনসনের বাণীকেই মূর্ত করে তুলল :

What fortitude the human soul
That it can thus endure
The accent of a coming foot,
The opening of a door……

তার হৃদয়ের বোঝা হালকা হয়ে গেল।

অদৃষ্টের ক্রূর নিয়তি মানুষের ছলনাকে কিভাবে পরাস্ত করে অদ্ভূত লীলা দেখায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মালিক স্টোনের চরিত্রে। সে তার স্ত্রীকে পায় নি, একমাত্র পুত্রও তাকে ছেড়ে গেছে। এই বিপুল অর্থের মধ্যেও সে একা, কিন্তু চরিত্রগত ছলনা, কপট অভিনয় শোষণ, বর্ণবৈষম্যকে সে সজাগ করে রেখেছে। স্ত্রী সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে পার্বত্য পথে মোটরে যেতে যেতে একদিন দুর্ঘটনায় স্ত্রীকে হারাল, নিজে অঙ্গ ভেঙ্গে হাসপাতালে পড়ে রইল। এবং কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। তার সমগ্র প্রচেষ্টাই যেন একটা শূন্যের লীলাখেলা।

উপন্যাসটির কেন্দ্রবৃত্ত জয়েসকে ঘিরে। জয়েসের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, তার জাতির উন্নতি আকাংক্ষা এবং তাকে ঘিরেই সমগ্র শ্রমিক সমাজ সুন্দর-ভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। তার চরিত্রের পাশেই সমান্তরালভাবে স্যালির চরিত্র আঁকা হয়েছে। স্যালি বিবাহিত জীবনে টমের ঔরসে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করতে চায়। তার অবচেতন মনে মাতৃত্বের আকাঙ্খা তাকে ব্যাকুল করে তোলে। অর্থের জন্যে টম অসম্মতি জানালেও সে নিজে সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে চেয়েছে। টমের এই ব্যবহারে সে মনের মধ্যে ব্যথা পেয়েছে। স্যালির এই দাম্পত্যজীবনের রূপটাই বারংবার কল্পনা করে জয়েস তার যুগলজীবনের আশাকে উদ্দীপিত করে রেখেছে। মাঝে মাঝে ঈর্ষাও জেগেছে। এদের কথা ভেবেই প্রকৃতির ছায়াঘেরা নির্জনে একাকী পথ ঘুরেছে। কিন্তু ব্যর্থপ্রেমে, হতাশ আঘাতে, মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে তার জীবন চূর্ণ হয়ে গেছে। একমাত্র গানের মধ্যেই সে সুর

খুঁজে পেয়েছে। বাস্তবজীবনের হতাশা স্বরের আনন্দে পূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু জীবনের এক দুর্ঘট মুহূর্তে অনন্ত গ্লানির বীভৎসতায় তার সহকর্মী ক্রুক্সের অন্তর্জালার সময়ে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। এই মানবপ্রীতির ভালবাসায় তার চিত্ত মিলনআনন্দে পূর্ণতর হয়েছে। জীবনের হতাশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে মানবপ্রেমে জয়েসের এই আত্মদান পরিপূর্ণ মানবিক। মনের অন্ধকোণে ব্যথার সাগরের নরম ঢেউ ভাঙলেও জীবনের ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য।

উপন্যাসটি তিনটি শ্রেণীর মানুষের চরিত্রচিত্রণে একটা ব্যাপ্তি এনেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষের বুকের ওপর যে শোষণনীতি চালিয়ে গেছে, বিভেদনীতি উস্‌কে রেখে বৈষম্যকে জাগিয়ে রেখেছে, তারই দৃষ্টান্ত আমেরিকান মালিক স্টোন ও তার সহকর্মীদের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসটির গুণাগুণ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় বইটি সুখপাঠ্য নয়। চরিত্রগুলি অনেকস্থলেই টাইপে পর্যবসিত হয়েছে। ঘটনায় প্রত্যক্ষতা অত্যন্ত স্বল্প, চিন্তা ও ভাষণই বেশি। জয়েসের চরিত্রই আমাদের মনকে বেশি আন্দোলিত করে, স্যালির মাতৃত্ববাসনা সার্বজনীন নারীত্বের প্রতীককল্প হয়ে উঠেছে। টমের মধ্যে টিপিক্যাল আমেরিকান যুবকের রূপ প্রতিভাত। স্যালির সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে যৌবন মধু পান করে তৃপ্ত হয়েছে, সন্তানের পিতাও সে হয়েছে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্যালির সঙ্গে তার জীবনের আদর্শগত ও স্বার্থের বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেই মুহূর্তে আসন্নপ্রসবা স্যালিকে ত্যাগ করে বাণিজ্য জাহাজে যুদ্ধের পরে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নানা বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সমুদ্রের বিভিন্ন বন্দরের মতোই বিভিন্ন রূপোপজীবিনীর জীবনবন্দর থেকে তাদের দেহসুধা অর্থ দিয়ে পান করে জাহাজে ফিরে এসেছে। স্যালির জন্যে কোনো অনুতাপের সুর তার চিত্তকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মথিত করে তোলে নি। বরং ল পাশ করবার জন্যে স্টোনের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে পত্র দিতে স্থির সংকল্প করেছে। সার্জেণ্ট চরিত্রটি প্রাণের সজীবতায় চঞ্চল। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো গুণ নেই—যা সহজেই পাঠকদের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

ঘটনার স্রোতও এত স্বল্প যে এগোতেই চায় না। কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তে চকিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটছে, যাতে বিস্ময় না জেগে আকস্মিকতার আঘাত মনের মধ্যে লাগে।

বর্ণনামূলক ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর চমৎকার পংক্তি মনের দিগন্তে কাব্যের ইশারা জাগিয়ে তোলে। এবং প্রায় প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে কাব্যিক পরিবেশ আনবার চেষ্টা করেছেন। যদিও অন্যত্র ভাষা এমন দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু একটি জায়গার বর্ণনা আমার মনে এক পুলকিত বিস্ময় এনে দিয়েছে। টম্ জাহাজের দুর্ঘটনার পাঁচ মাস পরে সান্ মার্টিন শহরে ফিরে এসেছে, নানাদেশের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে স্যালির কাছে ফিরে এসেছে, স্যালিকে প্রথম দেখেই তার মনে স্ট্রবেরি ফুলের উপমা মনে হয়েছে :

Reaching out his hand, he found hers ; her face was close and her eyes watching his. They were graygreen, he had almost forgotten. The face was one he had never seen before, yet knew every mark upon it, the freckles and eye-lashes, the coppery red hair drawn back. She was older. She was more beautiful than she had been before, he thought, older and he no longer remembered her. For a moment he felt a panic as if he had stepped forward to the wrong person. The lips were half open, the eyes half closed. Strawberry. Strawberry laughing in the lunch counter, and he pressed his mouth against hers and her arms locked around his neck. 186-87 pages.

ঔপন্যাসিক হিসাবে Alexander Saxtonকে যে শ্রেণীতেই ভাগ করি না কেন, ফরাসী সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য ও জার্মান সাহিত্যের মনের জটিল দ্বন্দ্বপূর্ণ উপন্যাসের কুহক মায়া ছেড়ে জীবনের চলমান আশা দীপিত সহজ সরল সাধারণ পথে মাঝে মাঝে যাত্রা করতে বরং ভালোই লাগে। নাভিশ্বাসে হাঁপ ছাড়ানো মন কিছুক্ষণের জন্য হালকা আলোর খুশির ঝলক পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। দৃপ্ত আশায় মন স্থিত হয়। মানবিক সত্যে আস্থা আসে।

সংস্কৃতি সংবাদ

রবীন্দ্রশতবর্ষে শান্তিউৎসব

নিখিলভারত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসব সমিতির উদ্যোগে পার্কসার্কাস ময়দানে দশদিনব্যাপী মেলা ও অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাম ও শান্তির আদর্শ যে সমস্ত স্তরের মানুষকে, দেশ-বিদেশের মানুষকে এক মহৎ অঙ্গীকারে মেলাতে পারে—এই বিপুল উদ্যোগের সাফল্য তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর স্মৃতি রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে মেলার কথাই বলেছিলেন। শহর কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত এই মেলার চরিত্র ছিল প্রথমে বাঙালী, তারপর ভারতবর্ষীয়, তারপর আন্তর্জাতিক। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রমেলার চরিত্র অন্যরকম হতে পারে না।

যদিও এক গোপন হস্ত ভাড়াটে লোক মারফৎ কলকাতার পথে-ঘাটে শান্তিসমিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর, সুদৃশ্য, ব্যয়বহুল পোস্টার লাগিয়েছিল, যদিও 'জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র'গুলি প্রথম দিকে এই মেলা সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা দেখিয়েছিলেন, তথাপি প্রত্যহ শহর, শহরতলী ও সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার নরনারী এই মেলায় যোগ দিয়েছেন। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহই বোধহয় একটি প্রখ্যাত ইংরিজি দৈনিকের নীরবতার তুষার গলিয়ে দিয়েছে। উৎসবের এই উত্তাপই হয়তো শেষ দিনে একটি প্রখ্যাত বাংলা দৈনিককে সম্পাদকীয় লিখতে উদ্দীপ্ত করেছে। কিন্তু অপর বাংলা দৈনিকটি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সেই বিখ্যাত তিনটি বাঁদরের মতো নিজের চোখ, কান ও মুখ বন্ধ রাখার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে।

শেষ পর্যন্ত স্টেটসম্যান ও যুগান্তর যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য দেশবাসী তাঁদের অভিনন্দিত করবেন। আর অপর যে পত্রিকাটি সাংবাদিক অসততা ও ভৃত্যতান্ত্রিকতার পরিচয় দিলেন—দেশবাসী তা-ও সহজে বিস্মৃত হবেন না। তবে, একটা কথা আর একবার প্রমাণিত হল। শান্তির আদর্শ ও রবীন্দ্রঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের যে অনুরাগ—কোনো অদৃশ্য হস্তের শাসন বা প্রলোভন বা অনুনয়ই তাকে স্তিমিত করতে পারে না। প্রমাণিত হল এই সংবাদ-বিক্রেতারা দেশবাসীর ইচ্ছা ও আকাংক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারেন না। নইলে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ পার্কসার্কাস ময়দানে ঘটত না।

এই বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সর্বত্র রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু উদ্যোগ ও আয়োজনের বিপুলতায় এবং অংশগ্রহণের ব্যাপকতায় এই মেলা ও অনুষ্ঠান যে ঐতিহাসিক চরিত্র অর্জন করল তার তুলনা নেই। দশদিন ব্যাপী এই মেলার সর্বত্র প্রীতি ও সহযোগিতার দুর্লভ পরিচয় পাওয়া গেছে। সরকারী প্রহরা বিভাগের সহায়তা বা ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, কংগ্রেস সেবাদল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি 'বিখ্যাত' প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ভিন্নই এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হতে পেরেছে। কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। দেশবাসী যে কত দায়িত্বশীল, তাঁদের সাংস্কৃতিক চেতনা যে কত প্রখর—আরও একবার তা প্রমাণিত হল।

তেমনই সহযোগিতা দেখিয়েছেন শিল্পীরা। চেকোস্লোভাকিয়ার বিশ্বখ্যাত শিল্পী রাত এগারোটায় দমদম বিমানঘাঁটি থেকে সোজা অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে মুহূর্তের বিশ্রাম না নিয়ে তাঁদের অনুপম সুরসৃষ্টির পরিচয় দিলেন। কিউবার বিশ্বখ্যাত ব্যালে নর্তকী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মঞ্চসমূহে নাচতে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি এই ময়দানের অত্যন্ত সাধারণ স্টেজে বিপুল শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করেও তাঁর অনুপম নৃত্যকৌশল দেখালেন। বৃদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কোনোক্রমে মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত রাগসঙ্গীত শোনালেন। অতি বৃদ্ধ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ইনভ্যালিড চেয়ারে বহন করে আসরে বসিয়ে দেওয়া হল—তিনি গান গাইলেন। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পিদল এমনই নিরহঙ্কার, এমনই সহৃদয়, এমনই শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। আর দেশ-বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পীদের পাশে আদিবাসী ও গ্রামীন শিল্পিদল এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মজুর শিল্পীরাও তাঁদের সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যের পসরা তুলে ধরেছেন। এমন যোগাযোগ ইতিপূর্বে কখনোই ঘটে নি।

তিনদিন কবি সম্মেলন হয়েছিল। বাংলাদেশের কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় থেকে নবীনতম কবির কবিতাও সেখানে পঠিত হয়। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের সম্পূর্ণ নিরক্ষর, বৃদ্ধ লোককবি রামখেরের কবিতা এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা ও বিদেশীয় কবিতা-আবৃত্তি এই কবি সম্মেলনে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র এনেছিল। উর্দু কবিরা সারারাত্রি-ব্যাপী মুশায়েরার পৃথক আয়োজনও করেছিলেন। তরুণ কবিবৃন্দ কবিতা-

গ্রন্থের এক নির্বাচিত প্রদর্শনী করেছিলেন। তরুণ নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের তরফে নবনাট্য আন্দোলনের এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল।

তাছাড়া মেলার প্রদর্শনী মণ্ডপটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম সরকার, চেকোস্লোভাকিয়া সরকার, রুশ ভারত মৈত্রী সংঘ, পূর্ব জার্মানী সরকার ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান তথ্যবহুল, শিল্প সৌন্দর্যে অনুপম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনপ্রবাহের প্রদর্শনীটি স্মরণীয়। আর তানসেন ব্যবহৃত তানপুরা সহ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ক প্রদর্শনীটি ছিল এই মেলার সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ও অপর শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের প্রদর্শনী ও ক্যাথে কোলভিৎজের গ্রাফিক আর্টের প্রদর্শনী পৃথক আলোচনার বিষয়। স্মরণীয় যে জার্মাণ ভ্রমণকালে কোলভিৎজই রবীন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন।

দেশবাসী কি গভীর গুরুত্ব ও অভিনিবেশ সহকারে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ প্রতিদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও শেষ দিনের প্রাতঃকালীন জনশিক্ষা সম্মেলন। অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সম্পর্কে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিন্তানায়কদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছেন।

আর ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শন। কানাল, ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, রুশ রবীন্দ্র-জীবনী, তলস্তয়ের জীবনচিত্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুর্লভ চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ উদ্যোক্তারা করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন একই সঙ্গে তিনটি মঞ্চে অনুষ্ঠান ও পর্দায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন—এই চারটি অনুষ্ঠান চলেছে। পুতুল নাচ, বিশেষভাবে প্রেরিত রোবসনের গান ও অর্নডাইকের আবৃত্তি, রুশ অনুবাদে ও কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাটক ও সঙ্গীত বা প্রাদেশিক সঙ্গীত পরিবেশন, ছায়ানাট্য, নাটক, যাত্রা, বিবিধ অনুষ্ঠান হাজার হাজার মানুষ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন।

দেশখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিক, মনস্বীকে উৎসাহী যত্রতত্র দেখা গেছে। বিদেশীয় অতিথিরা মাটিতে বসে মৃৎপাত্রে চা খেয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে দেখেছেন রবীন্দ্রপূজা বা রবীন্দ্রব্যবসায় নয়—রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বিশ্বসংস্কৃতির মিলন উৎসব। শতবার্ষিকী বৎসরে এইটিই তো কাম্য ছিল।

উৎসব উপলক্ষে সমিতির তরফে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে। আমরা পাঠকদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

নিখিলভারত শান্তিসমিতি যদিও রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিসমিতির প্রাথমিক উদ্যোক্তা, তথাপি এ কথাটি পরিষ্কার করে বলা দরকার শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিখিলভারত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব সমিতি নামে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল।

অনেক ব্যক্তিই এতে এসেছিলেন—যাঁদের সঙ্গে শান্তিসমিতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসব সমিতিই রবীন্দ্রমেলা ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পরিচালক। যাঁরা শান্তিসমিতি বা কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই মেলার কর্তৃপক্ষকে জুড়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছেন—জনসাধারণই তাঁদের নিজ উদ্যোগ ও উৎসাহে সেই কুৎসার যোগ্য জবাব দিয়েছেন।

কিন্তু আজ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রথমত নিখিলভারত শান্তিসমিতি যে-শান্তি আন্দোলন পরিচালনা করছেন, দেশবাসীর সঙ্গে 'পরিচয়' তার জন্য কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়ত শান্তিসমিতি প্রবর্তিত এই রবীন্দ্র-উৎসব সমিতি একটি পৃথক সংগঠন এবং এঁরা এঁদের কর্মের মাধ্যমে আপন সর্বদলীয় উদার চরিত্রটির পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয়ত এই সমিতি মেলা উপলক্ষেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সমিতির নিখিল ভারতীয় কাউন্সিল ও প্রায় পঁচিশ হাজার সহযোগী সদস্য এই সমিতিকে স্থায়িত্বদানের প্রস্তাব দিয়েছেন। দেশব্যাপী রবীন্দ্রচর্চা তথা সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মহৎ দায়িত্ব আজ এই সমিতির হাতে পড়েছে।

বাংলাদেশে সর্ববয়স ও মতের সাহিত্যিকদের তরফে সাহিত্যিকদের নিজস্বভাবে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী লেখক সংস্থা' গঠিত হয়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রবীণ-নবীন সর্বমতাবলম্বী সাহিত্যিক ও সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক এই সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লেখক সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের নামে, বৃহত্তর সাহিত্যাদর্শে লেখকদের মিলিত হবার যে উদ্যোগ ও প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ হল না। প্রায় সেই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করল এই রবীন্দ্রমেলা। কিন্তু কোনো কোনো সাহিত্যিক তাতেও অংশ গ্রহণ করলেন না। এই সময় কলকাতায় নিখিল ভারত আফ্রো-এশীয়-সংহতি-লেখক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন হল। এশিয়া-আফ্রিকার সংহতি ও উপনিবেশিকতার অবসান—এই ছিল সম্মেলনের আহ্বান। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি অনুসারী, বিবেকবান মানুষের তথা সাহিত্যিকের অবশ্য পালনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই সম্মেলনে ঐক্যের যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল—তাতেও কোনো কোনো বাঙালী সাহিত্যিক সাড়া দিলেন না। আর সেই সময়েই হঠাৎ কয়েকজন লেখকের একটি রাজনৈতিক বিবৃতি প্রকাশিত হল।

আণবিক বিস্ফোরণ মাত্রেই দুঃখকর। কিন্তু কোনো ঘটনাই প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে বিচার্য নয়। গত তিন বছরের ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাঁরা যে বিবৃতি প্রকাশ করলেন তাতে স্বাক্ষরকারীদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে সোভিয়েত বিরোধিতা। এই মনোভঙ্গি আরও প্রকট হয় যখন দেখি গত প্রায় দশ বছর এই আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিচুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি যে দাবি আন্তর্জাতিক শান্তিসংসদ পৃথিবীতে জনপ্রিয় করেছিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ যে অভীপ্সা ঘোষণা করেছিল—তার সমর্থনে এই সাহিত্যিককুলের অধিকাংশই সম্পূর্ণ নীরব থাকতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ বিবৃতিদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। তখন তাঁদের বক্তব্য ছিল শান্তির আহ্বান মানে রাজনীতি।

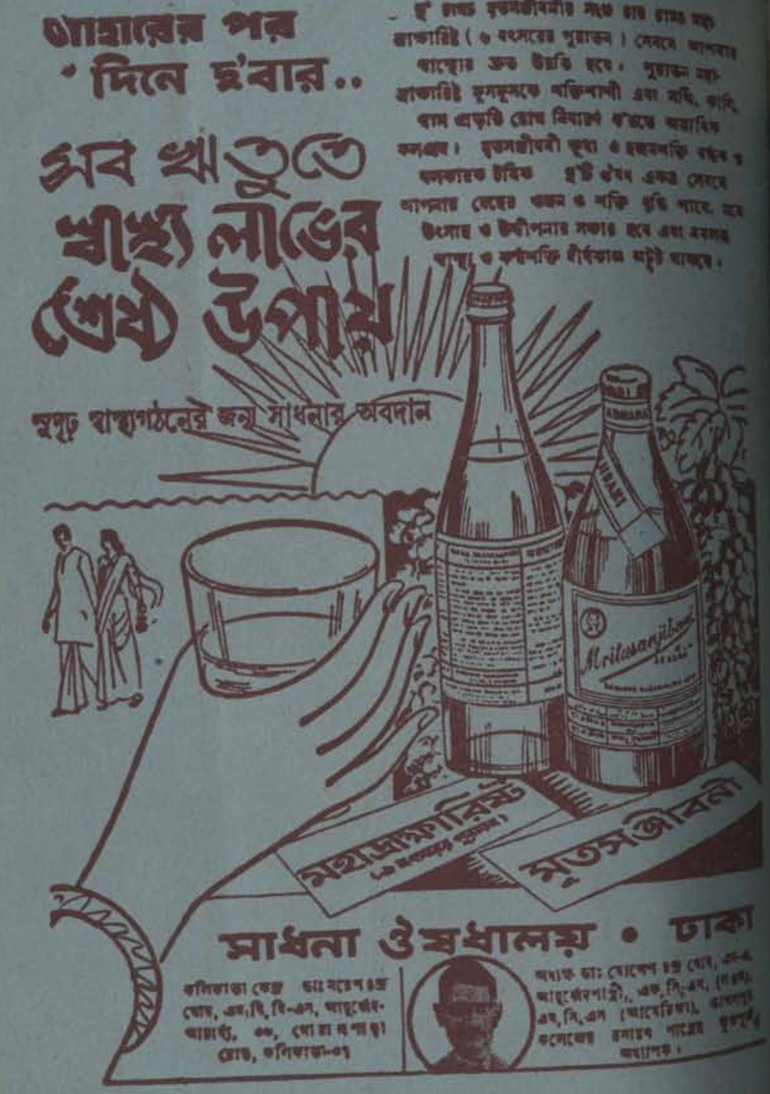
অথচ হাঙ্গেরি প্রভৃতি ঘটনায় প্রায়ই এঁদের কেউ কেউ বিবৃতি দিয়ে মানবতার ঋণ পূর্ণ করেছেন। করেননি মহাকাশে কণ্টক ক্ষেপণ, লুমুম্বার হত্যা, ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পাশবিক অত্যাচার, কিউবায় মার্কিন যুদ্ধ অভিযান প্রভৃতি ঘটনায়। কারণ তাতেও রাজনীতি করা হত।

শান্তিসংসদ জার্মাণ সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। হাঙ্গেরির সময়েও বলেছিলেন। আর যাইহোক—শান্তিসংসদকে পছন্দমতো কোনো ব্যাপারে নীরব আর কখনো বা মুখর হতে দেখি নি।

সুতরাং এই বিবৃতির উদ্দেশ্য ও কয়েকজন স্বাক্ষরকারীর চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমাদের বক্তব্য আর যাঁরা, অধিকাংশ যাঁরা—তাঁদের সম্পর্কে। আমরা জানি এঁদের অনেকেই এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে বুঝতে পেরেছেন নিছক মানবিক কারণেই বিবৃতিটি ছাপা হয় নি ; অনেকেই তাঁরা অনুতাপও প্রকাশ করেছেন। আজ তাঁরাই বলছেন লেখকদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি করে কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হল ?

এখনও সময় আছে। ন্যূনতম যে বিষয়গুলিতে সর্ব মত ও বয়সের লেখকরা মিলতে পারেন—উচিত হবে তার ভিত্তিতে তাঁদের একত্রে বসা : যে লেখক-সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়েছে, উচিত হবে তা সঞ্জীবিত করা। এই মেলার শিক্ষা হল ঐক্য ও মানবতার শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা। এই উৎসব সমিতি, বা, আঞ্চলিক লেখক সমিতি বা রবীন্দ্রশতবার্ষিক লেখক সংস্থা—যে কোনো একটির মাধ্যমে আবার বাংলা দেশের লেখকরা সমবেত হোন। পৃথবীর কারা শান্তির পক্ষে, কারাই বা যুদ্ধ চাইছেন তা বুঝুন। স্পষ্ট করে বলুন আমরা লেখকরা চাই সমস্ত রকম যুদ্ধাস্ত্র বর্জন, শান্তি চুক্তি, ঔপনিবেশিকতার অবসান, সহৃদয়তা। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বৎসরে এইভাবেই বাঙলা দেশের সাহিত্যকরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারবেন, যা পেরেছে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এই মেলায় মিলিত হয়ে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



দাম: পঁচাত্তর নয়া পয়সা

পরিচয়

অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়